মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

ভূমিকা

মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

ভূমিকা

পর্যায়ক্রম :

আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা
আধুনিক আধ্যাত্মিকতা
মহেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম দৃষ্টি
সুনিপুন প্রয়াস
দিকে দিগন্তে মহেন্দ্র
স্থিতিশীল অবস্থায়
ভাব গ্রহণ
ভাব প্রেরণ
পরীক্ষা নিরীক্ষা

সিদ্ধান্ত

প্রয়োগ পদ্ধতি নির্মাণ

শুরু কার্য

রচনাক্রম

স্তরে স্তরে আধ্যাত্মিকতা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেশানো

দূরমূল্য দর্শন ও প্রসাদ লাভ

আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদ

ছোট থেকে বড়-আবার বড় থেকে ছোট..

এরই মাঝে লুকিয়ে রয়েছেন মহেন্দ্র!

বিশ্ব -শিষ্য

বরেণ্য মহাপুরুষ বর্তমানে

আগামীর আধ্যাত্মিকতা

যুগ পরিবর্তনে যুব সমাজ

নির্লিপ্ত -কিন্তু অনন্তে বাস

তোমার -আমার সবার জন্য রাখা

এস এস বিশ্ববাসী।

পাবে নতুন দিশা

আধ্যাত্মিক নেশা

মিলনের অপেক্ষায় মহেন্দ্রনাথ

অন্তরে প্রবেশ করতে পারলে, আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়।

এই সূত্রটিকে প্রলম্বিত করলে বলা যায়... সেই ব্যাক্তিই ততটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন, যিনি যতটা অন্তরে প্রবেশে সমর্থ হয়েছেন।

এবার যে অনুভূতি শব্দটির প্রয়োগ ঘটানো হলো, তাতে এটি পরিষ্কার যে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অনুভূতির একটি বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান।

এবার বলুন তো... আমরা কে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধীন নই?

জগতে অন্তরে প্রবেশ করেন না বা করতে পারেন না.. এমন কে আছেন?

অনুভূতিবিহীন মানুষ কেমন বা আদৌ হয় কি?

আরও আছে..

আচার্য জগদীশচন্দ্র যে জড় আর জীবের ভিতর যে প্রাণের, তথা সংবেদনের অস্তিত্বর স্বাক্ষর প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন ও সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাতে তথাকথিত জড় ও নিম্নস্তরিও জীব, এ সবও

যে চেতনা সম্পন্ন ও অনুভূতি সচেতন... এটা তো মেনে নিতেই হয়, অতএব তারাও আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত!

এবার একটু অন্যভাবে দেখুন.. আমরা জড় পদার্থ নিয়ে আর নিম্নস্তরের জীবদের নিয়ে চিন্তা করছি, না ওরাও করছে?

ওরা কিভাবে এসব করতে পারে.. এতো অসম্ভব।

কিন্তূ যদি নাইই পারে তাহলে তো... বিবর্তনবাদ একটি হাস্যকর শব্দ হয়ে দাঁড়ায় নাকী?

এক্ষনে যদি মেনে নিই যে জগতে এমন কিছুই নেই... যা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন নয়, এতে প্রভুত উপকার লাভ করা যাবে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বহু আগেই বলে দিয়েছিলেন... লীলা মানুষ নিয়ে, কারণ মানুষে চেতনার প্রকাশ বেশি।

আবার সেই মানুষদের ভিতর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন মানুষও আছেন, যাঁর দুটি শিং বেরোয়নি এবং ঠাকুর তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

বলেছেন নরেন কে.. ভাববি, লোক না পোক।

তাহলে সবটা মিলিয়ে তুলে ধরলে আর তার সঙ্গে.. সিদ্ধ, সিদ্ধেরসিদ্ধ এইসব একটু বিশ্লেসন করলেই কি বিবর্তনবাদের সুন্দর শুন্য থেকে পূর্ণ পর্যন্ত পর্যায়ের ধারণা কি হয় না?

প্রমাণ দিচ্ছেন আবার, যেন ডিমে তা দিচ্ছে।

এটিই মহেন্দ্রনাথ এর আধুনিক ব্যাখ্যায়.. আঙ্গুলার ভিশন।

মন যদি নিজের মনটিকেই ভালো করে দেখতে চায়, তাহলে দৃষ্টি চক্ষুর বাহিরের দিকে থাকবে, না থাকবে ভিতরের দিকে?

অবশ্যই ভিতরের দিকে, তাই চোখের মণি তখন অন্তরের মণিমুক্ত খুঁজতে ব্যাস্ত আর ফলস্বরূপ কৌণিক পরিবর্তন।

শ্রদ্ধেয় মহাসাধক মহেন্দ্রনাথ নানান ডোজের আধ্যাত্মিকতার নিদান আমাদের দিয়েছেন... যার যেরকম প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবেই।

তিনি ঔষধগুলির নানান নামকরণ ও করে দিয়েছেন... যেটি তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর তালিকা!

কোনটা দিনে দুবার, কোনটা চারবার এবং কি পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে তাও একটু খুঁজে দেখলে মনে হয় বোঝা হয়ে যায়।

আসলে রোগ কোথায়?

স্বামীজীর কথায়... বেশিরভাগটাই মনে।

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের নাম গান করলে দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়, আবার নাকী হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে.. পাপ পাখি পালিয়ে যায়।

এগুলির ভিতর থেকে যে সত্য পরিস্ফুটিত হচ্ছে, অর্থাৎ নাম গান... একি বেসুরো, না ছন্দ ময়?

আর তালে তালে, হাততালি দিলে কি শব্দের অনুরণন হয় না?

মহেন্দ্রনাথ আধুনিক ভাষায় এগুলিকেই নিয়ে লিখেছেন আমাদের বোঝার জন্য :

Theory of Vibration, যেটির ভিতর আধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে উঁকি মারছে তাঁর সাম্য স্পন্দন তত্ত্বের উপর।

আবার তাঁর Theory of Sound দেখিয়ে দিচ্ছে.. নাদের শক্তি, যা দিয়ে এই বিশ্বজগৎ এর সৃষ্টি আর পরিবর্তনে লয়।

তাঁর নিত্য ও লীলা গ্রন্থটি... অসীম চেতনার বহুত্বে এবং সমস্ত অনুভূতি গ্রাহ্য বস্তুর একত্বে তথা অসীমে লয় উচ্চরবে কি ঘোষণা করছে না... আধ্যাত্মিকতা কেবলমাত্র একটি অধ্যায়, আমাদের অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার ভার ও ভর কেন্দ্র হয়ে?

আধ্যাত্মিকতা মন নিয়ে আর মানুষ মনবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

অতএব প্রতিটি মানুষ, আধ্যাত্মিকতাই পরিপূর্ণ.. শুধুমাত্র চাবিটির প্রয়োজন.. নিজে পরীক্ষা করে দেখার আর অনুভব করার।

কিভাবে তাহলে পাবো ওই চাবিকাঠি?

শুধু জেনে নিতে হবে মহেন্দ্রনাথ এর অসাধারণ.. স্নায়ুতত্ব।

এটিই সেই আধ্যাত্মিকতার চাবি!

[18:39, 30/11/2024] Bon: আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা..

মানব নামক যন্ত্রে এমন কিছু অনুভূতি লাভ যেটি সর্বাঙ্গসে ধ্বনাত্বক।

এই অনুভূতি লাভে

দেহে এবং মনে প্রথমত এক অজানা আনন্দের প্লাবন যেন এসে উপস্থিত হয়, কর্মের, বিশেষত এক নতুন ধরণের কর্ম সম্পাদন করার তাগিদ অনুভূত হয়, যে অনুভূতি লাভ হল–সেই সম্পর্কিও জ্ঞান স্বয়ংক্রিয় ভাবে জাগরিত হয় আর এই প্রথম অবস্থার পরেও

আরও কিছু আছে কিনা অথবা এই অবস্থাটিকেই স্থির রাখা যাবে কিনা –এই চেষ্টা সততই চলতে থাকে।

সবমিলিয়ে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কিরকম..

আমরা একটি এজাবৎ অজানা একটি রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

লিস্টে নাম ওঠার মতন নাম উঠে গেল এইমাত্র।

কিন্তূ প্রশ্ন হলো, এতদিন জানতে পারিনি কেন?

প্রযুক্তিটি এমনভাবেই নির্মাণ করা –যেটিতে অর্ধাঙ্গশ থাকে সাধারণভাবে দৃশ্বমান আর বাকিটা থাকে অদৃশ্ব!

একটু ব্যাখ্যা করে বলি, আমাদের যত কিছু আনন্দ ও জ্ঞান এর ঠিকানা... সেটি আমরা জেনে থাকি জন্মগত ভাবে বহিরজগৎ, অর্থাৎ, যেটি আমাদের কাছে দৃশ্বমান।

অতএব এই কারণেই, আমাদের সমস্ত তথাকথিত অনুভূতি, এই ক্ষেত্রটুকুর মধ্যেই সীমাইতো।

এবার কোনও এক কারণে যদি আমরা হঠাৎ করে, একটি আমাদেরই জীবনের অন্য অংশে ঢুকে পড়ি এবং সেই জগতের কিছু অনুভূতি আমাদের হয়ে যায়... যে সম্মন্ধে নিজেদের কোনই ধারণা পূর্বে ছিল না, তাকেই আমরা অতিন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি বলে থাকি।

আমাদের যেহুতু বেশিরভাগ মানুষেরই জীবন ওই পূর্বের বহির জগৎ ঘিরে আবর্তিত হয়ে, একদিন শেষ হয়ে যায়, তাই শিক্ষা থেকে শুরু করে জীবনের আলোচনা বুঝতে, আমরা ওই বহির জগৎটিকেই সর্বস্ব বলে মনে করি।

কিন্তূ কেউ যদি এর বাহিরের কোন ক্ষেত্রের সন্ধান পান এর সেটি তিনি বাহিরে এনে দেখাতেও সক্ষম না হন, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসব ব্যাপার ভাবি না!

কিন্তূ যদি কোনও ব্যাক্তি, ওই খবর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেন, তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি ধীরে ধীরে সেই দিকে একটু আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেন এবং ওই ব্যাক্তিটিকে একটু অন্য চোখে দেখতে শুরু করেন।

ভেবে বসেন হয়ত বা কখনো কখনো যে, ওই ব্যাক্তির ভাগ্য খুব ভালো বা তিনি এক অন্য মাত্রার চরিত্র সম্পন্ন মানুষ ইত্যাদি।

ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই তা নয়... এটি দৃঢ় নিশ্চিত করে বলা যায়, কারণ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর ওই সম্ভবনা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে এবং চাইলেই, অতি অবশ্যই এই জীবনকালেই তা আমরা পরিস্ফুটিত করাতে নিশ্চিতভাবে পারি।

শুধু আমাদের এই অনুভূতির উদ্বোধন ঘটাতে কি করতে হবে তা জেনে নিতে হবে এর এবার থেকে ওই জানার পদ্ধতি হবে এর পাঁচটি বিষয় যে ভাবে নিয়মানুসারে জানি, ঠিক তার অনুরূপ।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমাদের অমূল্য জীবনের অর্ধাঙ্গশ, কিছুতেই পূর্ণ করি না, যেহেতু এটির ক্রিয়া বা প্রকাশ আমরা বাহিরে সাধারণভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই।

জীবনের আসল সৌন্দর্য, তৃপ্তি, আনন্দ ও জ্ঞান... কিন্তু ওই আমাদের অন্তর জগতেই সঞ্চিত থাকে।

এইবার শেষে একটি কথা বলে শুধু এই পর্বের সমাপ্তি ঘটাই, যেটি হলো.... কার্যত বহির ও অন্তর জগৎ বলে কিছুই নেই, একটিই জগৎ রয়েছে!

আমরা বহির জগৎ বলে যেটি প্রত্যক্ষ করি, সেটি ওই জগতের আবরণ মাত্র এর ওই জগৎটিরই ভিতরে আমরা প্রবেশ করতে পারলেই... সমস্ত জগৎটা একযোগে দেখা সম্ভব হয়।

বহির আর অন্তরের ভেদরেখা মুছে গিয়ে... যে অনুভূতি লাভ হয়– সেটিই আধ্যাত্মিকতা।

তাই শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ বলছেন, "যেগুলোর মন ভিতরে ঢোকে না, তারা ওই আবরণ নিয়েই থাকে "।

আধ্যাত্মিকতা লাভ মোটেই খুব বীরত্বর ব্যাপার নয়, খুব সাবলীল এ স্বাভাবিক ব্যাপার।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণর শুভ আগমন... শুধু এটুকে শেখাতেই...

[18:39, 30/11/2024] Bon: [07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্রনাথ এর দুরদর্শীতা..!

যে চারটি সমাজের মূল স্থম্ভের কথা উনি প্রায় ১০০ বছর আগেই বলে গেছেন, সেগুলির ভিতর love, liberty ইত্যাদির সঙ্গে কি ছিল... জাস্টিস?

তিনি নিজে আগে এবং পরে তাঁকে রোজ খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হতো... কেন তাঁর প্রয়োজন ছিলো ওইসব খবর রাখার?

কারণ তিনি গা এড়িয়ে চলা মানুষজনের তালিকাভুক্ত ছিলেন না।

তাঁর কাজই ছিল সর্ব স্তরের মানুষজনকে নিয়েই।

তিনি এই প্রপার জাস্টিসের জায়গায়, অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায়... মহিলাদের বিশেষ দক্ষতার উপর তাঁর সমাজতান্ত্রিক রচনাবলিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আর আজ মিলিয়ে দেখলে, তাঁর দূরদর্শীতা পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না কি?

তিনি অনেক অনেক গভীরে ঢুকে,সমাধান সূত্রগুলি দিয়েছেন আর আমরা ধীরে ধীরে সেগুলিই শুধুমাত্র মিলিয়ে দেখছি!

অতএব যেটুকু আলোচনা এই ব্যাপারে আপাতত করা হল... তা আমার দৃষ্টিতে অন্তত সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্র চর্চার অন্তরভূক্ত।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: কাদের প্রয়োজন এই আধ্যাত্মিকতা লাভ?

সকলের প্রয়োজন, বিশেষত যুব সমাজের আর আগামী প্রজন্মের।

সত্যি কথা বলতে কি এই মহেন্দ্র দর্শন বা দর্পণ রচনার উদ্দেশ্য, তাদের সক্ষমতা, দুরদর্শীতা এবং প্রয়োজনীয় শক্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই একমাত্র।

পুরোনো ও প্রচলিত ধ্যান ধারণা সংস্কৃত করে এক নতুন কর্মময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় লোকের সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে করা সম্ভব।

আজকের যুগ, যাচাই করে নেবার যুগ আর আগামী যুগ, আরও বেশি করে যাচাই করে নেবার যুগ।

যাচাই করতে করা সক্ষম?

যাদের ইতিমধ্যেই জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে।

শুধু কি ভাবে ও কীসের ভিত্তিতে এই যাচাই করা শুরু করা যাবে.. সেটির একটু ছোঁয়া তথা ব্যাখ্যা করে দিলেই চলবে।

সরাসরি বলি কুলকুন্ডলিণীর জাগরণ থেকে অসংখ্য সূক্ষ স্নায়ুর ভিতরে অনায়াসে গমনা গমন এই যুব সমাজ নিশ্চিতভাবে অদূর ভবিষ্যৎ এ যে করতে পারবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

জো বা ম্যাক্লাউড এর কাছে একবার একটি চিঠিতে পন্ডিত রোমারোলা বলেছিলেন, যে তিনি বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞান এর চর্চার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরলাভ নিশ্চিতভাবে সম্ভব আর এই বিষয়ে স্বামীজি কি মত পোষণ করেন, এটা কি জো তাঁকে জানাতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, জো এর কাছে থাকা অনেক চিঠিই হারিয়ে যায় আর or ভিতরে স্বামীজীর ওই উত্তর ছিল কিনা তা জানা যায় নি।

কিন্তূ বহু বহু দৃষ্টান্ত এবং উক্তি আছে, যার ভেতর দিয়ে, এই বিষয়ের পূর্ণ সমর্থন স্বামীজীর আমরা পেতে পারি।

পূজনীয় ব্রহ্মানন্দজী, শ্রদ্ধেয় বশী সেন কে বলেছিলেন, ওই বিজ্ঞান সাধনার ভেতর দিয়ে, তুই সবকিছু পাবি।

আর মহেন্দ্রনাথ বলছেন, ভগবান পেতে চায়তো.. কঠিন রিজিড বিজ্ঞান এর ভেতর দিয়ে যাও..

অতএব স্পষ্ট যে এবার থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই চাই।

কি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি?

শুধুমাত্র সবকিছু কে একটি যাচাই করে নেবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি জানা।

ব্যাস, এটুকুই।

স্বামীজীর ভাষায়, ভাসা, ভাসা বৈজ্ঞানিক নয়।

এবার যদিও এখন সবাই জানেন, তবুও আরও একবার না হয়, বিষয়টির অবতারণা করি.. আচ্ছা কোন বিষয়টির ভিতরে বিজ্ঞান নেই?

এযুগের উত্তর... সব বিষয়ের ভিতরেই বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় আছে।

ঈশ্বর ঈশ্বর করি, তিনি নাকী সর্বময় আর তাহলে তাঁর উপস্থিতি কি শুধু কয়েকটি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

একেবারে ভুল ধারণা।

আমরা গভীরে প্রবেশ করি না বলেই, অনুমানে এবং পুরোনো মলিন জ্ঞান এর ভিত্তিতে বলি.. ঈশ্বরলাভ, আধ্যাত্মিকতা অর্জন, এসব ওই কয়েকটি নিদৃষ্ট বিষয়ের চর্চার ভেতর দিয়েই কেবলমাত্র হওয়া সম্ভব।

এইসব কথা এতদিন যা হোক চলেছে, কিন্তূ আগামী প্রজন্মের কাছে পরিতাজ্য, এটি নিশ্চিত।

অর্থনীতি থেকে সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি... সবকিছুই বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত।

কাব্য রচনার পিছনে যে ব্যাকরণ বর্তমান, সেটিও বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত, আর ইতিহাস বিকৃত হয়েছে বা হয়নি, সেটিও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেসন এ ধরা পড়ে যায়।

এবার যদি আমাদের কু সংস্কার এবং সু সংস্কার এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসি, তাহলেএকটি মজার ব্যাপার ঘটবে!

প্রথমত তো ওই শব্দ দুটিই বিশেষরূপে আপেক্ষিক।

যাই হোক তবুও ওই কু সংস্কারটিকে নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করি তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবো এই দেখে, বুঝে ও অনুভব করে যে, ওটির ভিতরেও পূর্ণভাবে বিরাজ করছে সত্য, সেই একই সত্য, যা আমার, আপনার এবং আপামর সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান।

শুধু খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন সবার.. নিজেদেরই বোঝা কমিয়ে, সোজা রাস্তায় বা পথে চলার জন্য।

তাই ভবিষ্যত চলবে সমকালীন পথ ধরে আর ওই সব পথগুলিই যেহেতু আধুনিক, তাই আধুনিক প্রজন্ম চাইবে যে আধ্যাত্মিকতার স্বাদ সেটিই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা নামে এক্ষনে কিছুটা আলোচিত হলো।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: আধুনিক আধ্যাত্মিকতা

এই আধুনিক শব্দটি প্রয়োগ করা হল কেন?

এর উত্তরে জানাই, বেশিদিন নয় –মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় জীবনযাত্রা এবং মানুষের চিন্তা শক্তির উপাদান যা ছিল, আজও কি ঠিক তাই আছে, না বহু বদলিয়ে গিয়েছে...

অবশ্যই বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

চিকিৎসা পদ্ধতি আজকের যা, ১০০ বছর আগে কি তাই ছিল?

নিশ্চই না।

এইরূপ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বহির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে.. আশা করি এই ব্যাপারে আমরা সহমত।

কিন্তূ অন্তর জগতের খবর কি আমরা রেখেছি?

সেখানে কি ঘটেছে...

একেবারে একই ব্যাপার ঘটেছে, আর তা না হলে, এই বহির জগতের কোনও পরিবর্তন আমাদের চোখেই পড়তো না!

আরও মজার ব্যাপার এই যে, ওই পরিবর্তন প্রথমে ঘটেছে... অন্তর জগতেই!

আগে কারণ না, আগে কার্য বা এই ক্ষেত্রে ফল?

অবশ্যই কারণ।

তাহলে যা কিছু পদ্ধতি, বিভিন্ন নতুন বিষয়ের অবতারণা, উদ্ভাবন... যা কিছুই ঘটেছে, তা প্রথমে ঘটেছে অন্তরলোকে।

যার ফলে বা প্রভাবে, আজ আমরা এতো নতুন নতুন পদ্ধতি, যন্ত্র ইত্যাদি দর্শন ও ব্যাবহারে সমর্থ হচ্ছি।

এবার একবার ভাবুন তো, ওই সব নতুন বিষয়গুলি সৃষ্টি করতে কি.. বহু সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে বেশকিছু মানুষকে কি গভীর ভাবে ডুব দিতে হয়নি?

না যদি তারা দিতেন, আজকে এই সব জিনিস বা জ্ঞান, এর কোনোটাই আমরা পেতাম না।

এবার ভেবে দেখি তো, তাঁরা কি পেয়েছিলেন আর কীসের প্রেরণাতেই বা এইসব কাজ করলেন।

তারা অবশ্যই আসল জিনিসের কিছু বা অনেকটা অংশ ইতিমধ্যেই নিশ্চিতরূপে পেয়ে গেছেন।

যে জিনিসটি তারা পেয়েছেন এবং এখনো কিছু না কিছু ব্যাক্তি এই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পেয়ে চলেছেন..

সেটিরই বর্তমান নাম আধুনিক আধ্যাত্মিকতা!

পথ আধুনিক.

আর যেহেতু ওই পথগুলির সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে ওই সব ব্যাক্তিসকল যুক্ত তাই যে ফল তারা লাভ করেছেন এবং করছেন.. সেটি অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদ!

এই প্রসাদ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর রাখা রয়েছে, আর এখন অনেক ভালো ভাবেই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ রেখে দিয়েছেন.. শুধু একটু বুঝে আর খুঁজে নিতে হবে এইমাত্র।

পূজণীয় মহেন্দ্রনাথ এর বিশেষত বিজ্ঞান পর্বের পুস্তকগুলি এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা লাভ করার উদ্দেশ্যেই রচিত।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্রনাথ এর অধ্যত্মদৃষ্টি..

এই দৃষ্টিতে কি দেখা যায়?

সর্বকালের রূপ একত্রে দর্শন হয়... সবটাই বর্তমান!

ভবিষ্যৎ– বর্তমানকালে কিভাবে দর্শন হতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। এর কারণ এনারাই ওটি গঠন করে থাকেন।

একি গল্পকথা?

একেবারেই নয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিও যদি বলি, তাহলে এটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে... চরমতম অন্তরদৃষ্টি!

আমরা কি ভাবতে সক্ষম যে, দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্ব গঠন করা যায়?

হ্যাঁ, এটিও করা সম্ভব, ওই অবস্থায় পৌঁছলে।

যদি জগৎটা ঈশ্বরের কল্পনা আর মায়ের খেলার বস্তু হয়, তাহলে শেষমেশ... মা যাঁদের খুব কাছের সঙ্গী করে নিয়েছেন, তাদেরও তো খেলাটি শিখিয়ে দিয়েছেন.. তাই না?

ভক্তি –অন্দরমহল পর্যন্ত যায়... শ্রী শ্রী ঠাকুর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহা পুরুষেরা এবং পূজনীয়া গৌরী মায়ের মতন মহামানবীরা অক্লেশে ওই অন্দরমহল এ যাতায়াতের ছাড়পত্র বহু আগেই প্রাপ্ত হয়েছেন।

ওই চরম আধ্যাত্মিকতার ভূমি থেকে অতএব যা কিছুই ঘোষিত হয়, তাই রূপ পরিগ্রহ করে তথাকথিত আমাদের এই বাস্তবের ভূমিতে প্রদর্শীত হয় মাত্র!

উদ্দেশ্য একটাই..

আমাদের সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি... শ্রী শ্রী ঠাকুরের উক্তি ও আশীর্বাদ অনুসারে –তোমাদের চৈতন্য হউক।

আমরা কি প্রাপ্ত হব?

এই শুভক্ষণে... সত্য বস্তু, অর্থাৎ, সত্য দর্শনে সমর্থ হব।

যার ফল ––জ্ঞান ও আনন্দ লাভ, বলিষ্ঠতা অর্জন, হওয়া অভয়!

এটিই মহেন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করে শেখাতে চেয়েছেন.. বিভিন্ন দিক দিয়ে–সমাজের পরিকাঠামোর উন্নতি সাধনের বিধান দিয়ে।

এটি চোখ বন্ধ করার সাধনা বা পথ নয়.. চোখ খুলে ধ্যান করার সাধনা।

সমাজ, তথা দেশ, অর্থাৎ বৃহদার্থে সমগ্র বিশ্ব ভাবনারই অপর নাম... মহেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টি।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: একটি পর্যবেক্ষণ...

বাহিরে যা বেতার.. ভিতরে তারও.. তার!

মহেন্দ্র স্নায়ুতত্ব পূর্ণভাবে প্রমাণিত।

আমরা বর্তমানে বেতার প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহারে খুবই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

কোনও তার নেই, কিন্তু কথা বার্তা, ছবি সহজেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তো বটেই, এমনকি অন্য গ্রহেও চলে যাচ্ছে এবং আসছেও বটে।

আমরা দেখছি বা ভাবছি তারবিহীন এই প্রযুক্তি-- কিন্তু মহেন্দ্র স্নায়ুতত্ত্ব প্রয়োগ করলে.. এই ধারণা আমূল বদলিয়ে যেতে বাধ্য!

কেন?

তিনি যে সূক্ষ্ম স্নায়ু তথা স্নায়ু তথা ভাব-জাল এর কথা বলেছেন, যা খালি চোখে দেখা যায়না বটে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় করে তোলা যায়.. তাহলে এই স্নায়ুসমূহ কে যদি সূক্ষ্ম তার হিসাবে আমরা ধরে নিই এবং যা বাস্তব ও বটে, সেক্ষেত্রে তারবিহীন কি বলা চলে?

এই সূক্ষ্ম স্নায়ুমন্ডলীর দর্শন ও ক্রিয়াকান্ড জানার নামই..

মহেন্দ্র চর্চা ও মহেন্দ্র সাধনা বলেই মনে করি।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন

এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদের ব্যাক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্তরদেশীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ঠিক কোন উপায়গুলি আমাদের অবলম্বন করতে হবে।

সাধারণভাবে যেসকল উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে, এগুলো সম্মন্ধে তো আমাদের সকলেরই কমবেশী ধারণা আছে, কিন্তূ যেটি বা যেগুলি প্রায় একেবারেই নেই –তা তবে কি?

এইখানেই মহেন্দ্রনাথের গুরুত্ব।

তিনি আমাদের জন্য এমন কিছু পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর যার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে আধুনিকতম উপায়ে সহজেই সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সমাধানে সমর্থ হই।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: এই পর্যায়ে তাই একটি সম্পূর্ণ নুতন মহেন্দ্র ভাবধারা ভিত্তিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে,যেটির যথাযত শিক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যাগুলিকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে সমাধানে সমর্থ হব।

এই নুতন বিষয়টির নাম :

মহেন্দ্র–স্নায়ু–বিজ্ঞান

এই বিজ্ঞানটির দুটি বিভাগ রয়েছে:

১– মূল স্নায়ুতত্ব

২– ফলিত স্নায়ু–বিজ্ঞান (বিপরীত ধ্যান)

এই অসাধারণ বিষয়টি গত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে রীতিমতোন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং আশাতিরিক্ত শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে।

অন্যান্য আর সব বিষয়ের মতন, এই বিষয়টিও প্রণালীবদ্ধ ভাবেই শিক্ষা করতে হবে।

এটি কিছুদিনের চেষ্টায় রপ্ত হয়ে যাবার পর থেকেই, এর প্রয়োগ করা সম্ভব হবে এবং সাথে সাথে আরও উচ্চতর শিক্ষা এবং প্রয়োগ পদ্ধতিরও বিস্তারলাভ ঘটতে থাকবে।

তাই পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে এই মহেন্দ্র-স্নায়ু-বিজ্ঞান তত্ত্বটির পরিচয় ও ব্যাখ্যা উভয়ই প্রদান করবো।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: সুনিপুন প্রয়াস..

তিনি প্রয়াস চালিয়ে গেছেন বহুবছর ধরে আর এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ এক ভিন্নপথে, যা কোনোভাবেই প্রচলিত পথগুলির অনুবর্তী একেবারেই ছিল না।

তিনি একসময় বলেছেন, আমি তপস্যা করেছি -কলম নিয়ে!

এই কলম ধরার অর্থাৎ, তাঁর রচনার পূর্ববর্তী পর্যায়ে অবশ্যই তিনি যে সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন, এতে কোনও দ্বিমত এর স্থান নেই।

কি এই সাধন পদ্ধতি আর লক্ষ্যই বা কি ছিল তাঁর?

[18:39, 30/11/2024] Bon: [07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: সমাজ, দেশ ও কালের গভীর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেসন ও কথোপকথন এবং স্পন্দন তত্ত্বের সাধন সঙ্গে গভীর অধ্যাঅন –এইগুলি একত্রিত ভাবে তাঁর মহা তপস্যার ক্ষেত্রটি রচনা করেছিল।

আর লক্ষ্য হিসাবে তিনি ঈশ্বর বা ভগবানের, এমনকি আত্মদর্শন ইত্যাদিকেও না বসিয়ে স্থির করেছিলেন... এক অতি মহিমাময় লক্ষ্য!

তাঁর তপস্যা বা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন একটি প্রশ্ন কে কেবলমাত্র।

এই প্রশ্নটির উত্তর প্রাপ্ত হওয়াই অতএব ছিল তাঁর মহান জীবন ব্রত।

তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানতে চেয়েছিলেন... এই যে মহাসৃষ্টি, এটির প্রস্ফুটিত হবার কারণ কি?

কেন উৎপত্তি লাভ করলো এই সৃষ্টি?

দেখুন কি বিশাল নিঃস্বার্থ এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পাশাপাশি যদি লক্ষ করি তাহলে বুঝতে আসুবিধা হবার কথা নয় যে তিনি কি মাত্রায় অসাধারণভাবে কোনও প্রভাব কাটাতে সমর্থ ছিলেন, কারণ তাঁর কৈশোর বয়সেই, ওই উল্লেখিত প্রশ্ন টি তাঁকে প্রভাবিত করে –অথচ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে তিনি ওই কালে মাঝে মাঝেই দর্শন করছেন ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করছেন। পর্যবেক্ষণ

করছেন তাঁর নিজের দাদা, রামদাদা, এমনকি গিরিশচন্দ্রের মতন মানুষজনের আচার ব্যবহার।

ওদিকে শুনছেন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ইত্যাদি।

এদিকে সংসারে অনটন ও মামলা মোকদ্দমা সামলানো!

তিনি কিন্তূ নিষ্ঠায় অবিচল..

তাঁকে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতেই হবে... কেন করবেন?

এ নিয়ে ভাববার অবকাশও তাঁর ছিল না।

তিনি তাঁর অন্তর থেকে উত্থিত মহাপ্রেরণা ও এক মহাজ্ঞান লাভের অন্বেষণ –স্রোতে তীব্র ভাবে ভেসে চলেছেন।

কোনও বাধাই তাঁকে বাঁধতে না পেরে ছেড়ে দিলো,এমনকি স্বামীজীর প্রয়াসও তাঁর ক্ষেত্রে কাজ করলো না।

নির্ভীক মহেন্দ্রনাথ সমস্ত গণ্ডী ছাপিয়ে হয়ে পড়লেন একা আর ছুটে চললেন এক দেশের ভিতর দিয়ে অন্য আরেক দেশে, এইভাবে ইউরোপ ভুখন্ডের অনেকটা, এশিয়ার পালেস্টাইন, জেরুজালেম থেকে আফ্রিকার সীমান্ত প্রদেশীয় অঞ্চলগুলি তাঁর মহান পর্যটনের অন্তরভুক্ত হোলো আর বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হল এক নিদর্শন... যেটির নাম আত্মবিশ্বাস!

তিনি কপর্দক শুন্য অবস্থায় এই পর্যটন শুরু করে ছিলেন, পাথেয় এসেছিলো আর তিনি বেঁচেও ছিলেন কিভাবে?

এরই ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে.. তাঁর আমাদের জন্য রেখে যাওয়া মহান শিক্ষা।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

সুনিপুণ প্রয়াস..২

হ্যাঁ, আত্ম, অর্থাৎ, নিজের উপর বিশ্বাস, সত্যই কীভাবে স্থাপন করা যায়, তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ।

আরও অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আত্মবিশ্বাসের পড়াকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তূ এই রচনা যেহেতু মহেন্দ্রনাথ কে নিয়ে, তাই কেন্দ্রে অবশ্যই থাকবেন তিনি।

এই বিশ্বাস অর্জন করার প্রেরণা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাপ্ত হবার উপাদান কি ভাবে.. সংগৃহীত, সংগঠিত এবং স্থিত হয়.. এই নিয়ে আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করি।

প্রথমত, ভারতীয় জন্মান্তরবাদের যে অতি প্রাচীন প্রমাণিত তত্ব, তা এই বিষয়ের বিশ্লেসন এ দৃঢ়তার সহিত পুনঃ প্রমাণিত হয়।

একদিনে বা এক জন্মে মহেন্দ্রনাথ তৈরী হয় না, এটি নিশ্চিত।

বহু অভ্যাস ও কৃচ্ছ সাধনের ফল... এমন এক মহান জীবন প্রাপ্তি।

যেটি শিক্ষণীয়, প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যই অনুসরণীয়।

এক্ষেত্রে তাহলে প্রথমত তাঁর নিজ জীবনের নিদর্শনকেই আমাদের আত্মবিশ্বাস লাভের সূচনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

এই শিক্ষার মধ্যেই কিন্তূ লুকিয়ে রয়েছে একটি মহাবাণী!

যেটি হল, আদর্শহীন হলে আত্মবিশ্বাস যথার্থ রূপে বিকশিত হয় না, আবার এই আদর্শ নিয়ে ভাবলেই... ওটির ভিতর থেকে দেখুন, অন্যজন, অন্য কিছু –এইসব ভাব এসে পড়তে বাধ্য।

তার মানে অগোচরে এটি, নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষাদান করে চলে!

এবার ওই দুটির সংযোগে যে প্রয়াস সাধিত হয়, তাই আমাদের আত্মনির্ভরতা, যা পক্ষান্তরে আত্ম বিশ্বাস এর নামান্তর.. সেটিকে বাড়িয়ে নিয়ে চলে।

ধীরে ধীরে ওদিকে অভিজ্ঞতার রকমারি সম্পদে আমরা পূর্ণ হয়ে চলি।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আবার ব্যবহারযোগ্য।

অতএব ব্যবহার ও নিত্য নূতন নুতন অভিজ্ঞতা লাভের চর্চায়, আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি ক্রমশ!

ভাবার এরকম কোনো অবকাশ নেই, যে যত সহজে এই ক্রমগুলি বর্ণিত হচ্ছে, তা খুব স্বচ্ছন্দে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে...

মোটেও না।

বহু ঝড় ঝঞ্জা, আঘাত সয়ে সয়ে, তবেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে ও আমরা এই আঘাতের ফলেই শক্তিলাভে সমর্থ হচ্ছি।

এই আঘাত আসছে আমাদের মহেন্দ্র তত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তরের স্নায়ু বা স্নায়ুসমষ্টির উপর, ফলত অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় শক্তি প্রবাহিত হতে শুরু হয় আর আমরা সত্যই শক্তিমান হয়ে উঠি।

চেতনার বিকাশ ও বৃদ্ধিও অনুরূপভাবে সমান্তরাল পন্থায় হয়ে থাকে.. বিভিন্ন ভাবের তথা স্নায়ুর উন্মোচনের মিলন মন্ত্রে।

এইভাবে আদর্শনিষ্ঠ যে কোন ব্যাক্তি এই অভিষ্ঠ লাভে কৃতকৃতার্থ স্বচ্ছন্দে হতে পারেন।

এবার অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন... ওই আদর্শের স্থানে যদি আমরা ছল, চাতুরী বিশিষ্ট কোন লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হই, সেটিকে কি যথার্থ আদর্শ বলে গ্রহণ করা সম্ভব?

এটির উত্তর –যুগোপৎ হ্যাঁ এবং না, কারণ আমরা যেকোনো বিষয় নিয়ে যত বেশী করে ভাববো, তাতে কিছু না কিছু পরিমাণ চেতনার বিকাশ অবশ্যম্ভাবি, কিন্তূ ওই চেতনালব্ধ মানুষ নামক যন্ত্র টির

এর ফলে মোহে, অর্থাৎ নিম্নগামীতার দিকে চলে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, আর এর ফলে অর্জিত শক্তি অযথা ব্যায় হতে থাকবে বারংবার।

এটিকেও নিয়ন্ত্রিত করে যথার্থ শুভ লক্ষ্যের পথে, আমরা কি উপায়ে চলবো... এটিও যথার্থ শিক্ষালাভের অঙ্গীভূত বিষয়।

এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও অবশ্যই আমরা তাই আলোচনায় স্থান দেবো।

তাহলে পরবর্তী অংশে এবার আমরা মনোনিবেশ করি।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

সুনিপুন প্রয়াস ৩

মহেন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে অভূতপূর্ব ভাবে যথার্থ বিজ্ঞান এর প্রয়োগ গঠিয়েছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ওই বিজ্ঞানটি এতই সাবলীল ভাবে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে, তাকে আলাদা করে যেন কোনো জটিল তত্ত্বের অনুশীলন করতে চলেছি বা যে তত্ত্বগুলি সংমিশ্রিত হয়েছে সেগুলিকে জটিল আখ্যা কোনোভাবেই দেওয়া সম্ভব হয় না।

অতএব তাঁর বিজ্ঞান এবং ওই বিজ্ঞান জনিত দর্শন, যাই বলা হোক না কেন... তা সর্বজনের উপযোগী, যে কোনো অল্পশিক্ষিত

মানুষ, যা আগেও বলা হয়েছে, এই নতুন মহেন্দ্র ভাবধারা অনায়াসে গ্রহণে সমর্থ।

এটিই মহেন্দ্র জাদু!

এই জাদুকাঠির ছোঁয়াতে একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যায়, জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সবচেয়ে অদ্ভুত যেটি, সেটি হল, ai অন্তর তথা মনের গতিপথের পরিবর্তন উপর থেকে চট করে কোনো মানুষকে দেখে --বুঝে নেওয়া যাবে না... মহেন্দ্র প্রযুক্তির দৌলতে তথা আশীর্বাদে।

এতে হারাবার কিছু নেই, কিন্তূ পাবার বস্তূ অনেক।

প্রাপ্তির তালিকায় :

যথার্থ জ্ঞান

প্রভুত শক্তি

আনন্দ লাভ

সমস্যার সমাধান

লক্ষ্যের দিকে যাত্রা

সামাজিক উপকার সাধন

যা মহেন্দ্র চর্চায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে অন্যান্য যে কোনো আর পাঁচটা যথার্থ সত্য নির্ভর চর্চার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও সেগুলি ঘটার সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু পরিত্রাণ পাবার সর্ববিধ উপায়ও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এই ক্ষেত্রে বিষে বিষক্ষয় এর মতন... স্নায়ু দিয়ে স্নায়ু জয় করার এক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ দর্শনের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছেন।

এর ফলে বিপদ এলেও, সহজেই সেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আমরা সমর্থ হব, এটি নিশ্চিত।

তিনি আরও বলেছেন সোজাসুজি যে, ঐসব আসবে... ওতে ভয় পাবার কিছু নেই, আর ওগুলো এলেই একমাত্র বোঝা যাবে যে, আমরা লক্ষ্যপথে ঠিক ঠিক এগোচ্ছি।

ওই বিপদগুলির এক বৃহদংশের নামই হল –মোহ।

এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্মন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর এই পর্যায়ে কিছুটা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এই মোহ আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞান এর যেন একটি স্ট্রাকচার এর মতন!

ওই স্ট্রাকচারে যেমন বেশ কয়েকটি বৃত্ত থাকে –ছোট থেকে বড় আর তথাকথিত ইলেক্ট্রন নামধারী কণা রা, ওই একেকটি বৃত্তে অনবরত ঘুরতে থাকে।

মোহও আমাদের ঠিক ওইরকম কোন একটি বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে অনবরত আমাদের ঘুরিয়ে বেড়ায়, কিছুতেই আর আমরা ওই বৃত্ত থেকে বেরোতে পারি না।

কিন্তূ মহেন্দ্র প্রক্রিয়া আবলম্বনে, আমরা ওই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে পারি তো বটেই, সাথে আরও অনেককিছুও করতে পারি।

এটমিক স্ট্রাকচারের শেষ বৃত্তটিতে যে ইলেক্ট্রন কণারা ঘুরে বেড়ায়, সেগুলি যদি কোনো বিশেষ কারণে, একটি স্ট্রাকচার থেকে অন্য আর একটি স্ট্রাকচারে যেতে চায়, তখন যে আলোকের গতির মতন অতি অল্প যে সময় লাগে, তাকে ট্রানজিট টাইম সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, আর মজার ব্যাপার এই... যখন একটি ইলেক্ট্রন কণা একটি অর্বিট থেকে অন্য অর্বিটে যাবার জন্য যখন জাম্প দেয় –তখন প্রচুর আলোক নির্গত হয় আর ওই পূর্বের ইলেক্ট্রন কণাটির নাম হয়ে যায় ফোটন!

এই নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি বিষয়, যেটির প্রথাগত নাম ফোটোনিক্স।

আর ওই যে ট্রানজিট টাইম এর কথা বলা হয়েছিল –ঠিক ওই সময়ে ওই ইলেক্ট্রন জাতীয় কণারা যে ধরণের ব্যবহার করে থাকে, তাকে বলা হয় –ট্রানজিট রেসপন্স।

মোহ আর মোহের নিরসন এর ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরুপ ব্যাপার সংসাধিত হয়।

কোনো ধরণের উত্তেজনা ব্যাতিত, কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ইলেক্ট্রন কণারা যে স্থানান্তরে গেল, তার জন্য যেমন উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল.. মোহ কে সরাতেও, ঠিক তেমনি উত্তেজনার প্রয়োজন।

এই উত্তেজনা আসলে কি?

একটি নতুন স্পন্দন এর আগমন মাত্র।

আমাদের স্নায়ু বা স্নায়ু জালের ভিতর যদি ওই বিশেষ স্পন্দনটিকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলেই মোহ সরে যাবে আর আমরাও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার সুবিধা পেয়ে যাবো।

মোহ ধ্বংস হয়না বা সাধারণ অর্থে কেটেও যায় না... শুধু চলার বা অগ্রগতির পথ টি থেকে দূরে সরে যায়।

সব ধরণের মোহই, এক এক ধরণের স্পন্দন।

আর ওই মোহ সমূহকে সরাতেও ব্যবহার করতে হবে অন্য কিছু স্পন্দন এইমাত্র।

এই দুই ধরণের স্পন্দন এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নিয়েই হাজির... মহেন্দ্র স্নায়ু বিজ্ঞান।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: এবার তাহলে দেখা যাক, ওই দুই ধরণের স্পন্দন এর স্বরূপ কি এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণই বা কি উপায়ে করা সম্ভব।

আবার দেখুন, মহেন্দ্রনাথ স্ব মহিমায়, এক্ষেত্রেও কি আসামান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ।

তাঁর সব অসাধারণ তত্ত্বের ভান্ডার থেকে, এবার তিনি বার করে আনছেন ওনার আরও একটি তত্ত্ব, যেটির নামকরণও উনিই করেছেন।

এটি হল, তাঁর বাইফারকেশন অফ মাইন্ড তত্ত্ব টি।

তত্ত্বটির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট, যে এক্ষেত্রে কোনও দ্বিধাবিভক্তিকরণ এর কথা বলা হচ্ছে।

কীসের ওই বিভাগ?

মনের কেবলমাত্র।

মন কে, কি আবার ভাগ করা যায় নাকী?

হ্যাঁ, যায়, তবে একটু অন্যভাবে।

আমরা যখন কোনও বিষয়ে চিন্তা করি, তখন সেই বিষয়টাই প্রাধান্য যে পায়, এটা সবাই জানি, আর সেই সময়ে অন্য কোন চিন্তা এলে, অনেক সময় হয়ত আমরা বিরক্ত বোধ করি অথবা আমরা নিজেরাই অজান্তেই একরকম অন্য অন্য চিন্তার ভিতরে চলে যাই।

মহেন্দ্রনাথ এই আমাদের চিন্তাপ্রণালীর উপর কিছু বক্তব্য রেখেছেন ও কিছু নির্দেশও দিয়েছেন।

তিনি এলোমেলো বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাগুলির উপর আমাদের আধিপত্য বিস্তার করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে।

তিনি প্রথমত বলছেন যে, চিন্তা এমনভাবেই করা উচিত, যাতে সেইকালে মনে অন্য কোনও চিন্তা স্থান কিছুতেই না পায় আর যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে... সেই বিষয়ের সঙ্গে একিভূত হয়ে যেতে হবে।

এতে দুদিক থেকেই আমাদের লাভ-এর ফলে যেমন আমরা, আমাদের চিন্তার বিষয়টি সম্মন্ধে পূর্ণভাবে জানতে পারবো, ঠিক সেইরকম যদি কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হয়, সেটির যথার্থ সমাধান খুব সহজেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শুধু যেটির প্রয়োজন হবে, সেটি হল কিছু এই নিয়ে অভ্যাসের।

এই অভ্যাস অজান্তেই আমাদের ধ্যান এর ভূমিতে উন্নীত করাবে।

এবার আবার মূল কথায় ফিরে যাই -সেই দ্বিধাবিভক্তিকরণ।

যখনই কোনও চিন্তা হয় তখনই স্পন্দন এর উৎপত্তি হবেই হবে।

উল্টো দিক থেকে স্পন্দন রয়েছে মানেই -চিন্তাও রয়েছে নিঃসন্দেহে!

আপনারা হয়ত বলতেই পারেন যে হঠাৎ ভূমিকম্প হল বা এয়ারক্র্যাফট টি আকাশে ওঠার আগে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিলো...

এসবের ভিতরে চিন্তার স্থান কোথায়, সর্বোপরি ওগুলো তো সব স্থূল ব্যাপার, মানে মন টোন থাকলে, তবেই না চিন্তা আসার প্রশ্ন।

এগুলোর সব মিলিয়ে, একটাই উত্তর... চিন্তা নেই, এমন কোনও অনুভব আপনি করতে একেবারেই সক্ষম নন।

অনুভব অর্থে –একটি বা সংমিশ্রিত চিন্তার অনুভব কেই বোঝায়!

মহেন্দ্রনাথ এর সিমিলার ভাইব্রেশন ক্যাচেশ সিমিলার ভাইব্রেশন – এই তত্বটিই এটির প্রমাণ।

আপনার চিন্তার স্পন্দন, ওই ভূমিকম্প বা উড়ানের স্পন্দন এর সঙ্গে, এক হয়েছে বলেই, আপনি ওই ক্রিয়া টি অনুভব করতে পেরেছেন।

তাহলে আপনার যদি মনে ওই চিন্তার স্পন্দন জাগরিত হয়, সেক্ষেত্রে ওই তথাকথিত ঘটনা ও বস্তুর ভিতরেও, একই স্পন্দন উপস্থিত, এটি স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে।

চিন্তা আর চিন্তার গভীরতার ভিতরে পার্থক্য কি?

শুধুমাত্র স্পন্দন মাত্রার।

প্রথমটি যদি কম স্পন্দন মাত্রার হয়, দ্বিতীয়টি অধিক মাত্রার.. এটি নিশ্চিত।

পর্যবেক্ষণে এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপস্থিত হচ্ছি যে আমাদেরই ভিতরে এমন প্রযুক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে নানান স্পন্দন মাত্রা তৈরী করা সম্ভব।

স্পন্দন এর মাত্রা যত বেশী হবে, তার আবেশের পরিধিও ততই বেশী হবে।

মহেন্দ্রনাথ তাই অন্যত্র আবার বলেছেন..

গ্রসার ইজ দা ভাইব্রেশন, শরটার ইজ দা রেঞ্জ –ফাইনার ইজ দা ভাইব্রেশন, লঙ্গার ইজ দা রেঞ্জ।

তার মানে সোজা কথায় –একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল স্পন্দন ও অন্য টি সূক্ষ্ম!

অভ্যাস এর মাধ্যমে, ওই দুই স্পন্দন এর ওপর আমাদের তিনি নিয়ন্ত্রণ আনতে বলেছেন।

কেন বলেছেন?

কারণ জীবন সংগ্রামের জন্য নিত্যদিন, এই স্থূল শরীর থাকা অবস্থায়, আমাদের স্থূল স্পন্দন জনিত চিন্তা বা ওই স্পন্দন এর উপস্থিতি থাকবেই, আর আমাদের চরম লক্ষ্যতে পৌঁছোবার জন্য অতি অবশ্যই সূক্ষ্ম স্পন্দন কে অবলম্বন করতেই হবে।

সেইজন্য নিত্যদিনের কাজের ভিতরেই উচ্চ পথে নিজেদের চালিত করার প্রচেষ্টাটিই.. মহেন্দ্রনাথের বাইফারকেশন অফ মাইন্ড নামক অসাধারণ তত্ত্বটি!

মনের লয় হলে আর ওই অবস্থায় স্পন্দনও থাকে না।

এই পর্যায়ের আলোচনা পরে করার ইচ্ছা রইলো।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: দিকে দিগন্তে মহেন্দ্র..

হয়ত ভেবে বসছেন, আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, এসব বিজ্ঞান বা অন্য জাতীয় কথা আসছে কেন?

আধ্যাত্মিকতা তো একটি ভিতরের ব্যাপার, কিছুটা গোপনীয়ও বটে, ওতো ভক্তি করলেই বোঝা যায়,ব্রত, উপবাস, পূজা এসব নিয়েই তো ওই জগৎ।

সব ঠিক বলেছেন, কিন্তূ আরও যদি বেশী কিছু পেতে চান বা অন্যের বিশেষ দ্বারস্থ না হয়ে, নিজেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে আপনি যা করেন বা বিশ্বাস করেন, সেসব যেমন করছেন, তাই করেও কি, এই নতুন যে কথা মহেন্দ্রনাথ বলছেন, তা কি শুনবেন না?

আপনি তো একজন আধুনিক মানুষ, তাই তো, আর জানিনা এই আধুনিকতার যথার্থ সংজ্ঞা আপনার কাছে কি... শুধুই অনুকরণ না নিজে অনুভব করা সত্যই খুব ভালো কিছু আর শান্তিপ্রদ এক জীবন লাভ করা।

যেটিই হোক আজ বা কাল আমাদের ঘুম ভেঙে যাবেই, কারণ ঘুম ভাঙার প্রয়োজন হবেই।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই আপনি বা আমি বাস করি না কেন।

ঘুম না ভাঙলে, বহির শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে কোনভাবেই রেহাই মিলবে না।

আপনি বলবেন, কৈ আমার আবার শত্রু কোথায় আর আমি তো জেগেই রয়েছি।

ঠিক আছে আপনার কথা আমরা শুনলাম আর কেবল একটি প্রশ্ন আপনার অমূল্য সময় নস্ট হবে জেনেই করছি

... আচ্ছা আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য টি ঠিক কি আর যথার্থ সফলতা বলতেই বা কি বুঝব?

হয়ত উত্তর পাওয়া যাবে, কেন এই তো বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স বা অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট বেশ মোটা অংকের, দেশ বিদেশে ভ্রমণ, নাম ডাক.. ব্যাস, এর ওপর আর কি আছে?

আর হ্যাঁ, আমি তো নিত্যই পুজো বা এইজাতীয় কর্মও তো করি।

কিন্তু এই যে এতগুলি লক্ষ্য স্থির করেছেন, কিন্তু ওই সবকিছুর মাত্রাও কি স্থির করেছেন?

না, এখন যা স্থির করছেন, কিছুদিনের পরেই, তা আর সেই জায়গায় থাকছে না, মানে, ওই লক্ষগুলিও যেন চলতে শুরু করে আপনার সাথে... শুধু তফাৎ এই যে, আপনি বা আমি সর্বদা চলি, ওই লক্ষ্যের পিছনে পিছনে।

ওই লক্ষ্যগুলো কে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বা স্থির রাখা যাচ্ছে না.. তাই তো?

অর্থাৎ সোজা কথায় ওই লক্ষ্য গুলি অস্থির হওয়াতে, ওগুলির প্রভাবে... আমরা স্থির, শান্ত থাকবো কি করে?

তাই, আমরাও সর্বদা অস্থির অবস্থায় রয়েছি, ঠিক কিনা..

কিন্তু লক্ষ্য বহু না করে যদি, একটিই করে নিই আর সেটি যদি একেবারে স্থির লক্ষ্য হয়, তাহলে চেষ্টা করে আমরা নিশ্চিতভাবে ওই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছতে পারবই... এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর ওই লক্ষ্যের মধ্যে যদি পূর্ণ আনন্দ, জ্ঞান ও শান্তির আশ্রয় মেলে নিশ্চিতভাবে... আমরা কি সচেষ্ট হব না?

মহেন্দ্রনাথ দিকে দিগন্তে মানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থরাজীর ভিতর দিয়ে, শুধু আমাদের এই সজাগ হবার ও যথার্থ লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে... সর্ব প্রাপ্তির ঠিকানাটা বলে দিয়েছেন!

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

এই দর্শন পর্যায়টা অত্যন্ত বিস্তৃত আর বহুমুখীও বটে।

কারণ মহেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ ও বিকাশ মুখের বর্ণনা দিয়েছেন।

এর সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, উদাহরণের ভেতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়া আর প্রয়োগ করতে পারা আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে বহু জনের কল্যাণে।

শুনতে একটু অন্যরকম লাগলেও, স্বচ্ছন্দে বলা যায়, এই আধ্যাত্মিকতা কিছুটা হলেও –ছোঁয়াছে রোগের মতন, তবে এই রোগের ছোঁয়াতে... অন্য বহু রোগ থেকে সেরে ওঠা যায়!

মহেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনা ও লাভের উপায় কে বেশ কয়েকটা পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়।

যেমন :

প্রভাবিত আধ্যাত্মিকতা

সম্পূর্ণ অহংকার নির্মূক্ত আধ্যাত্মিকতা

বিচারশীল আধ্যাত্মিকতা

স্বস্বাদন আধ্যাত্মিকতা

শুধু দর্শনেই আধ্যাত্মিকতার উদ্রেক

সমর্পন আধ্যাত্মিকতা

বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা

কর্মীয় আধ্যাত্মিকতা

যোগীও আধ্যাত্মিকতা

চিন্তন আধ্যাত্মিকতা

সংযোগ আধ্যাত্মিকতা

বিশ্ব-স্পর্শ আধ্যাত্মিক তা ইত্যাদি।

ওপরে উল্লেখিত ওই বিভিন্ন ভাবের মধ্যে দিয়ে নানান স্বাদের, মাত্রার ও পছন্দের আধ্যাত্মিকতা লাভ করা সম্ভব।

তাহলে আমাদের বুঝে আর জেনে নিতে হবে আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাই এক না বহু প্রকারের।

সঙ্গে ঠিক কোন ধরণের অনুভূতি বা অবস্থাকে আধ্যাত্মিকতা পর্যায় ভুক্ত করা যায়।

শেষে ওই আধ্যাত্মিকতা লাভে... কি সত্যিই কোন বিশেষ লাভ আছে..!

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

স্থিতিশীল অবস্থায়..

যখন তিনি যথার্থ প্রাজ্ঞ অবস্থাটি লাভ করেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে জগৎ কে কিছু দেবার উত্তেজনা থাকলেও, সেই উত্তেজনা কিন্তু কোনও বিশেষ ভাবের প্রভাবে ঠিক নয়, অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত নয়।

ফলত বলাই যায়, এটি তাঁর এক অসীম স্থিতিশীল অবস্থায়–নিজেরই রূপান্তর যেন অনেকটা একটি বিস্তীর্ণ ভূমি থেকে হরেকরকম ফুলের গাছ বেরিয়েছে আর অসংখ্য নানান রঙের ফুল তাতে শোভা পাচ্ছে!

গাছগুলি হাওয়ায় হেলছে –দুলছে... কিন্তু ওই মাটি বা ভূমি কি তাই করছে?

অনেক সময় গাছে গাছে ঢেকে গিয়ে, মাটিই আর দেখা যাচ্ছেনা, এই অবস্থাও তো হয়... মহেন্দ্রনাথের এই স্থিতিশীল অবস্থা অনেকটা তাই, এই মাটির সঙ্গে তুলনীয়।

আর ওই মহেন্দ্র–মাটি থেকেই বেরিয়েছে নানান জাতের ভাব–ফুলের গাছ.. রঙে রঙ্গে ভরে গেছে প্রান্তর!

এই অবস্থা আমাদের সবার হয় না কেন?

আমরা যতক্ষণ আমাদের ভিতরে সংস্থাপিত প্রযুক্তির ক্রিয়াটি না বুঝতে সক্ষম হব... ততক্ষন পর্যন্ত আমরা এই রহস্য কিছুতেই ভেদ করতে বা ওই বর্ণিত অবস্থাটি প্রাপ্ত হতে পারব না কিছুতেই।

আধ্যাত্মিকতা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার.. ওই অসাধারণ প্রযুক্তিটি জানা।

যিনি এই যে জ্ঞানটি সম্মকভাবে লাভ করছেন, তিঁনিই যথার্থ আধ্যাত্মিক গুণাগুণ সম্পন্ন এক ব্যাক্তি।

তিনিই প্রকৃতভাবে তাঁর মনটিকে জয় করেছেন তো বটেই, উপরন্তু পূর্ণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করতেও সফল হয়েছেন।

তথাকথিত বাহিরের আন্দোলনে, তিনি আর বিন্দুমাত্রও বিচলিত বোধ করেন না।

মনীষী মহেন্দ্রনাথ পুস্তক গুলি রচনার পূর্বে অর্থাৎ ওই বাগানের ফুল গাছগুলির মতন বেড়ে ওঠার আগে, মনের মাটিকে উর্বরিত করে নিয়েছিলেন তাঁর প্রভুত শ্রম ও সাধনায়... যেটির প্রথাগত নামই হল তপস্যা। আর তাঁর এই আধুনিক তপস্যার পদ্ধতি ছিল কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন কে ঘিরে!

তিনি এই তপস্যায় সিদ্ধ হবার পরে, অর্থাৎ, সঠিক উত্তর মেলার পরবর্তী পর্যায়ে... ওই সুদুর্লভ স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যেটিকে শাস্ত্র ব্রহ্ম তে স্থিতিলাভ বলে নির্দেশ করেন।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

কে আধ্যাত্মিক নন?

স্বামীজী বলছেন, ইচ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন।

একটু অন্যভাবে ওই একই কথা কে বলা যায়, Every Person is Originally Divine.

কেউ এর ব্যাতিক্রম নন।

সত্যিই অনন্ত সম্ভাবনা ও শক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে..

শুধু জাগিয়ে দিলেই হবে।

শক্তির প্রকাশ নিয়েও চিন্তা করার কিছুমাত্র দরকার নেই,ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হবে।

আর এই শক্তি জাগাবার হরেক মন্ত্র মহেন্দ্রনাথ পুনরায় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর আধ্যাত্মিকতা শুধুই নিজের ভেতর নিজে প্রবেশ করে শক্তিকে বাইরে নিয়ে এসে সমাজ,দেশ ও জাতির তথা সমগ্র বিশ্বের উন্নতি সাধন।

শাস্ত্র বলতে কি বুঝবো?

ওই অন্তরে প্রবেশের উপায় জানা।

তাহলে আধ্যাত্মিকতাটা কি?

ওই প্রবেশের ফলে,যা লাভ হবে,সেটাই আধ্যাত্মিকতা।

তাহলে প্রবেশ কি ভাবে করবো?

কতরকমভাবে যে করা যায়,তার কি শেষ আছে...

এটাই কি তাহলে শ্রী শ্রী ঠাকুরের,যত মত –ততো পথ?

মনে হয় সেটাই।

শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্য, সংগীত, বাণিজ্য, কাব্য, অভিনয়, চিকিৎসা,যোগ,যে কোনো বিষয়ের চর্চা... এই সমস্তকিছুর ভেতর দিয়েই এই আধ্যাত্মিকতা পূর্ণভাবে লাভ করা সবার পক্ষে নিশ্চিতভাবে সম্ভব।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: এবার একটু এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের পেছনে যে বিজ্ঞানটা আছে,সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখি।

মহেন্দ্রনাথ বলেছেন আর এটা প্রমাণিত সত্যও বটে যে... শক্তি কখনো সোজা পথে চলে না।

এই শক্তির বিভিন্ন ভাব সহায় যে চলা,এটাই বিভিন্ন স্নায়ু গঠনের মূল সূত্র!

নতুন না হয় একটা সূত্র বলা যাক... নিজের ওপর প্রভাব বিস্তার যত বেশী করা যাবে,অন্যের ওপর ওই প্রভাব স্বয়ংক্রিয় ভাবেই পড়বে!

এটা অবশ্যই সৎ অর্থে বুঝতে হবে –আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে।

বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান এ মাইকেল ফ্যারাডের একটা প্রখ্যাত পরীক্ষা আছে যেটা,ফ্যারাডেস লজ অফ ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাকশন বলে আমরা সবাই জানি।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করা হয় --যদি কোন জায়গায় একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, তাহলে অন্য একটি বিশেষ ভাবে গঠিত যন্ত্রে, সেই তরঙ্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়!

আপাত দৃষ্টিতে, ওই দুই যন্ত্রের ভেতর কিন্তু কোন তারের সংযোগ থাকে না।

এখানে ম্যাগনেটিক শব্দটি এইজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু বিদ্যুৎ আর চুম্বক এর মধ্যে কিছু বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান।

আমরা শুধু এখন একটু এই সরল অথচ অর্থবহুল যন্ত্রটির গঠনের দিকে দৃষ্টি দেবো।

প্রধানত একটি লম্বা তার কে পাকিয়ে পাকিয়ে একটি কুন্ডলি গঠন করা হয় আর তার ফলেই, ওই আবেশ ক্রিয়া দৃশ্যমান হয়।

তার মানে একটা বেশ বড় তার সুতোর রীল এর মতন ছোট জায়গায় চলে এলো।

আমাদের এই শরীরের মধ্যেও ঠিক একইরকম প্রযুক্তি কাজ করছে।

অজস্র দীর্ঘ থেকে অতি দীর্ঘ সব স্নায়ু, এই ছোট শরীরের মধ্যে রয়েছে, যেন নানান তারের কুন্ডলী!

আর মন?

এর ব্যাপ্তি তো ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে।

পুরো এই মনের অসীম জগৎ-- সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম দীর্ঘতর থেকে দীর্ঘতম আপাত অদৃশ্য সুতো বা অসংখ্য স্নায়ু দিয়ে তৈরী!

ওই অনন্ত স্নায়ু জালের ভেতর... অনন্ত শক্তি সুপ্ত ভাবে রয়েছে!

এই জাল থেকে কোন একটা বা বেশ কিছু ভাব অবলম্বন করে, যদি কিছু কিছু করে শক্তি বের করে আনার পদ্ধতি,আমরা প্রয়োগ করতে শিখে যাই.. সেটাকেই সাধনা বলে।

আর যেহেতু এই শক্তি নিজের ভেতর থেকে নিজেকেই আহরণ করতে হবে.. তাই এটাকে আধ্যাত্মিকতা বলা হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে আমরা বিষয়টা নিয়ে আরও আলোচনা করবো।

আপাতত বলে রাখি, সংগীত, নৃত্য, যোগ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি,সমাজনীতি এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে বা যথাযত চর্চার মাধ্যমে আমরা এই শক্তি আহরণ প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছন্দে শিখে নিতে পারি।

কোনো গোপনীয়তা নেই!

ভারতে তাই শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের এতো প্রসার লক্ষ করা গেছে।

বিস্তর গবেষণা হয়েছে, চর্চা হয়েছে, শুভফল লাভ হয়েছে আর ফলাফল প্রকাশও করা হয়েছে।

এবার হবে শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান!

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: তার মানে সোজা কথায়, মহেন্দ্রনাথ তাঁর ওই যৌবনকালে, ওই মহাপুরুষ থেকে বিকীরিত শক্তির দ্বারা পূর্ণভাবে আবেশিত হয়ে পড়ছিলেন।

এই আধ্যাত্মিক পরীক্ষা একাদিক্রমে ১১ দিন ধরে চলেছিল।

এই জাতীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি কে বর্তমানে... "প্রভাবিত আধ্যাত্মিকতা"এই নামে চিহ্নিত করা হল।

এই জাতীয় অনুভূতি করানো এবং করার বিজ্ঞানটা কী?

এটা কোনও কাকতলিও ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণভাবে কার্য ও কারণ সম্পর্কের ক্রিয়া মাত্র।

যে কুন্ডলিনী শক্তির জাগরণের কথা আমরা বিশেষত শুনতে পাই.. সেটার ফলিত নিদর্শন এটাই।

বেশকিছু সূক্ষ্ম স্নায়ু মন্ডলী যদি কোনো ব্যাক্তির উন্মুক্ত হয়, তাহলেই ওই স্নায়ু মন্ডলীর, অর্থাৎ কিনা অজস্র অদৃশ্য তারের ভেতর দিয়ে প্রবল গতিতে অন্তর তথা স্নায়ু –বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকবে।

এর ফলে স্বামীজীর কথা মতন, সমস্ত দেহটি যেন একটি বিদ্যুতাগার এ পরিণত হবে আর ওই বিদ্যুৎ এর স্পন্দন মাত্রা খুব বেশী হওয়ায়, তার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

উল্টো দিকে অবস্থানরত কোনো সমজাতীয় ব্যাক্তি, অর্থাৎ, তারও কিছু সূক্ষ্ম স্নায়ুমন্ডলী অবশ্যই উন্মুক্ত... তিনি ওই অপর ব্যাক্তির নির্গত শক্তির দ্বারা আবেশিত হয়ে পড়বেন.. এতে কোন সন্দেহ নেই।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিলো।

তিনি পূর্ণ মাত্রায় আধ্যাত্মিক ভাবে প্রভাবিত বা আবেশিত হয়ে পড়েছিলেন।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

প্রভাবিত আধ্যাত্মিকতা

যে মূল বিভাগগুলো করা হয়েছিল, তার ভেতর প্রথমেই প্রভাব ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নিয়ে একটা পর্ব।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম পুস্তক –সাধু চতুষ্ঠয় তে, এই আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওই বইতে যে চার মহান ব্যাক্তির চরিত্র চিত্রন করেছেন, তার ভেতর, একজনের প্রভাব তাঁর ওপর কী ভাবে কাজ করেছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তে তারই অল্প আলোচনা এই পর্বে।

১৮৯৪ সালে মহেন্দ্রনাথ হৃষিকেশে যান এবং এক মহাপুরুষের দর্শনলাভে নিজেকেই ধন্যবোধ করেন।

কলকাতায় ফেরার বহু পরে, তিনি ওই মহান সাধুজীকে নিয়ে কিছু লেখেন, যা এই বইটি থেকে আমরা প্রাপ্ত হই।

"আইয়ে গুরু মহারাজ"বলেই চুপ সাধু।

এবার হয়ত কাঠবেড়ালী গেল, তাকেও, ওই একই কথা!

মহেন্দ্রনাথ এর বয়স তখন ২৩/২৪ আর সাধুজীর ৮০র ওপর।

মহেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন আলাপ করবার, কিন্তু যখনই দিনে, দুপুরে বা অন্য সময় যাচ্ছেন, তখনি দেখেন, সাধু ওই একইভাবে কাকপদী হয়ে বসে রয়েছেন।

এবার আসল কথা।

মনে মনে নানান প্রশ্ন ঠিক করে নিয়ে যাচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ, কিন্তু ওখানে গেলেই যেন এক অদ্ভুত আনন্দময় শক্তির বেষ্টনির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন তিনি আর সব প্রশ্ন মনেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

ক্রমান্যয়ে ১১ দিন এই অবস্থা চলল আর পরে যখন বিশ্লেসন করেছেন মহেন্দ্রনাথ –সেই থেকে আমরা জানতে পারি, সর্বদাই ওই মহান সাধু অবস্থান করতেন চেতন–সমাধিতে আর ওনার দেহ থেকে এক আভা ও শক্তিপুঞ্জ নির্গত হতো।

এই বিকিরীত শক্তি পুঞ্জের প্রভাব আশ্চর্যজনক আর আনন্দময়।

এক্ষেত্রে এমন ব্যাপার ঘটার কারণ কী?

আগে যে বৈদ্যুতিক আবেশ প্রক্রিয়ার কথা বলেছিলাম, এখানেও ওই একই ব্যাপার ঘটছিলো।

ধরুন ওই সাধুজী এক বিশাল অন্তর-বৈদ্যুতিক প্রবাহর স্নায়ু কুন্ডলী, যা প্রভূত শক্তি বিকিরণে সমর্থ... আর এদিকে মহেন্দ্রনাথ ও এক ঠিক ওই জাতীয় এক উন্মুক্ত স্নায়ুর কুন্ডলী, তবে ওই কালে কোনো বিশেষ ভাবের, অতি উচ্চ শক্তি বিকিরণে অসমর্থ।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

প্রভাবিত আধ্যাত্মিকতা..

এই পর্যায়ে আলোচনা করি প্রথমে অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে, কারণ এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে অলৌকিকতা যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে বা আছে।

হ্যাঁ, ওনার কাছে যারাই গেছে, তারা বলে অনেক উপকার পেয়েছে.. নিশ্চই কিছু একটা আছে ওনার মধ্যে! একবার গিয়েই দেখি না।

ওখানে গেলে সত্যিই একটা যেন শান্তি পাওয়া যায়, আর যেই ফিরে এলুম ব্যাস, যে কে সেই।

ওই বইটা পড়েছিস, ওতে ওরকম অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে, দেখবি -পড়লে ভালো লাগবে।

আবার হয়ত সত্যিই খুব কোন অথেন্টিক কোন বই পড়ে জানা গেল যে, কোন ব্যাক্তি সত্যই স্বপ্নে কোনো মন্ত্র পেয়েছিলেন বা বিশেষ কারুর দর্শনলাভ করেছিলেন ইত্যাদি।

এইসব নিয়ে আরও একটু এগোবার আগে, দু একটা ব্যাপার একটু ভেবে রাখি:

১) আজ যা অলৌকিক.. তার কার্য-কারণ সম্পর্ক জানলেই, লৌকিক হয়ে যায়!

২) বেতার আধ্যাত্মিকতা

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের দর্শন যেহেতু এই পর্যায়ের আলোচনার বিষয়, তাই মূলত আমরা এই ক্ষেত্রেই দৃষ্টি কে একটু সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

ওনার রচিত -গুরুপ্রাণ রামচন্দ্র দত্তের অনুধ্যান.. শ্রী শ্রী ঠাকুর এসেছেন, জাজিমের ওপর বসে আছেন, ঘর নিস্তব্দ.. শুধু গ্যাস এর বাতির একটানা একটা আওয়াজ... দূরে কিশোর মহেন্দ্রনাথ।

প্রথমে চামড়ার ওপর, তারপর হাড় ভেদ করে যেন শক্তিটা ভেতরে ঢুকতে চাইছে আর ভেতরের শক্তিটা প্রবল বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

একটু পরেই আস্তে আস্তে বাইরের শক্তিটা ভেতরের শক্তিটা কে পরাজিত করে ফেললো!

আর আশ্চর্যের ব্যাপার.. দেহে মনে সঙ্গে সঙ্গে এক আনন্দের তরঙ্গ খেলতে শুরু করল!

শক্তিটা এবার ঘর ছাড়িয়ে –বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো আর যারা ওখানে ছিলেন –সবাই যেন কিরকম একটা আবেশিত হয়ে পড়লো... এরপর হয় তারা নেশা গ্রস্থ

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: লোকের মতন যে যার বাড়ির পথ ধরলো আর নয়তো নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে একটু পরে উঠে ছাদে লুচি ইত্যাদি খেতে বসে গেলেন... কারুর মুখে কোন কথা নেই।

আবার, বহুকাল বাদে মহেন্দ্র অনুগামীর রচিত –স্মৃতিতর্পন বইতে, মহেন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন, ঘরে ওনার টিম টিম করে হ্যারিকেন এর আলো জ্বলছে আর এই সন্ধের দিকে, দু চারটি আগন্তুকের উদয় হল, যারা চুপচাপ এসে বাইরে রাখা বেঞ্চে বসে রইলো প্রায় দু থেকে তিন ঘন্টা... কোনদিক থেকেই, কোনো কথাবার্তা নেই!

কিন্তূ যখন উঠে গেল, তখন কিছুটা যেন আচ্ছন্ন অবস্থা আর কিছু যেন পেয়েছে.. এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

প্রভাবিত আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কেউ ধরুন রয়েছেন বিদেশে, হঠাৎ স্বপ্নের মতন এক অবস্থায় – এক দর্শন!

জীবনে দেখেন নি, এমনি এক মূর্তি, কিছু কথা বলেই.. আর নেই!

এ না ঠিক স্বপ্ন, না বাস্তব, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে।

টার্গেট কে লক্ষ করে দীক্ষাবান যিনি ছুঁড়ে ছিলেন ধরুন এই ভারত থেকেই... তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল!

বেতারে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত।

মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা..

আজকের আধুনিক মানুষ, তারা যে শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন, তারা সাধারণ প্রযুক্তির ভেতর দিয়ে, কোনও জিনিস কে যত সহজে এবং সঠিকভাবে বুঝতে পারবে, অন্যকিছুর তুলনায় –এটা বলার অপেক্ষা রাখছে না।

এরপর রয়েছে, অতি বিশাল বিশ্ব–যুব–সমাজ.. এরা বিচারশীল, বিচক্ষণ, পরিশিলিত, অনেকাংশে শিক্ষিত এবং যথেষ্ট বোধযুক্ত।

অতএব আধুনিক পদ্ধতিতে কোনও নতুনভাব গ্রহণে এরা প্রবল উৎসাহী এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

সোজা কথায় আধ্যাত্মিকতা, যা কিনা শক্তি ও শান্তিলাভের পথ.. সে পথের উৎকর্ষ ও কার্যকারীতা তাদের সামনে যথাযতভাবে তুলে ধরতে, আমাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনা ও চর্চার ক্ষেত্রটিকে প্রথমে মজবুত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

এটা করতে হবে সম্পূর্ণ ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আর যুক্তি সাজিয়ে সাজিয়ে..

এই যুগ তো বেতারের যুগ--সবকিছুই আমরা বিনা তারে কাজ সারতে চাইছি।

গলায় মালার মতন ব্লু-টুথ ডিভাইস, হাতে সেল ফোন বা ট্যাবলেট PC, ঘরের AC বা TV চালাতে রিমোট কন্ট্রোল, এমনকি নানান খেলনাও সবই বেতারের সাহায্যে চলে!

তাহলে এই বেতারের সামান্য জ্ঞান তো আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু কাজে লাগতেই পারে।

বিশেষ করে ছোটরা যখন জিগেস করবে... এটা কি, ওটা কি – এটা কেমন করে হচ্ছে ইত্যাদি।

এ না হয় বুঝলাম, কিন্তূ শুরু কি করে করা যায়?

মহেন্দ্রনাথের বহু আগে লেখা একটা বই রয়েছে, যেটার নাম :থিওরি অফ ভাইব্রেশন আর এর সঙ্গে রিফ্লেকশনস অফ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (অনুবাদ).. এই বই দুটো যদি একটু পড়ে নেওয়া যায় তাহলে খুব সুবিধে হয়ে যাবে।

একটু জানতে হবে 'স্পন্দন'বলতে ঠিক কি বোঝায়, কীসের স্পন্দন হয়, কেন হয়, কখন হয় –এইসব ব্যাপার।

আর আশ্চর্য প্রথম প্রথম পড়ার সময় লাগবে.. ওই রামকৃষ্ণ সম্মন্ধে বইটি, যাতে একজন মানুষের ভেতরের স্নায়ু থেকে নির্গত হয়ে 'স্পন্দন'কি করে অনেকের জীবন বদলিয়ে দিতে পারে আর সাথে শক্তি আর শান্তিও পাওয়া যায়.. বিনা তারের মাধ্যমে।

এবার ওই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিভাইসগুলোতে যে বেতারের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে... সেখানেও তো দেখছি শুধুই নানান 'স্পন্দন'এর খেলা!

প্রথমটাকে মানে মহেন্দ্র রচনার কিছু স্পন্দন কে ভিত্তি করে যে বিনা তারে সব কাজ চলছিল.. সেগুলো কে, বিনা তারের আধ্যাত্মিকতা যদি বলি, আর এই আধুনিক বেতার প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনা করি তাহলে কি পাচ্ছি?

১) উভয় ক্ষেত্রেই দূর থেকে শক্তি প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভব।

২) স্পন্দন এর পরিবর্তন ঘটালে, ভাবেরও পরিবর্তন ঘটে।

৩) উভয়ক্ষেত্রেই শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়

৪) দুটো ক্ষেত্রেই, আমাদের জাগতিক এবং মানসিক -যা আধ্যাত্মিকতার নামান্তর.. চাহিদা মেটানো সম্ভব।

৫) দুটিরই ক্রিয়া-কৌশল স্পন্দনময়।

৬) আধুনিক এবং আধ্যাত্মিক -দুটোতেই অলক্ষে, সেই সূক্ষ্ম স্নায়ুজাল উপস্থিত।

অতএব-

আধুনিক বেতার প্রযুক্তি =আধ্যাত্মিক বেতার প্রযুক্তি, যে এক... এটা প্রমাণিত হল।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা..২

এই পর্যায়ে আরও কিছু বলার আছে, আর মনে হয় এগুলো একটু জানা থাকলে, আমাদের চলার পথ টা –একটু হলেও সহজ হয়ে যাবে।

রহস্যপ্রিয়তা.. স্বামীজি বলেছেন মানুষের মনের পক্ষে ভালো নয়।

একদম ঠিক কথা, এতে নিজেকেও যেমন অনেকক্ষেত্রে আসুবিধেতে পড়তে হয়, তেমন অযৌক্তিক অলৌকিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে, নানান দুর্নীতির পথ প্রসস্থ করাও হয়।

তাই মহেন্দ্রনাথও আমাদের যাচিয়ে বাজিয়ে নিয়ে অর্থাৎ, বিজ্ঞানের পথ ধরে আমাদের এই যুগে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

এতে আমাদের নিশ্চিত কল্যাণ যে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে বহু মানুষের হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহেন্দ্র নাথের ভাইব্রেশন তত্ত্ব অনুসারে একই জাতীয় স্পন্দন.. দুই বা বেশী বা অনেকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ।

এই ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ রচিত দুটো বইয়ের আজ সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে :

১) Theory of Motion

২) Mentation

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ৩

সূক্ষ্মদেহ কি শ্বাস নেয়?

বিশ্লেসন করলে তো তাই দাঁড়ায়!

মানে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার ভিত্তিতে, আমরা বেঁচে রয়েছি এটা জানি।

আর যখন আমরা ওই ক্রিয়া আর দেখতে পাই না, তখন বলি – আর নেই.. তাইতো?

কিন্তূ মহেন্দ্রনাথ, স্বামীজী এবং পুরো ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র তো – অন্য কথা বলছে।

বলছে, এই দেহ চলে গেলেও নাকী ভাবদেহ বা লিঙ্গদেহ থেকে যায় ইত্যাদি।

স্বামীজি আবার ওনার 'রাজযোগে' বলেছেন, "এই যেমন আমি তোমাদের দেখছি,সেরকম যদি আমি মনের স্তরের পরিবর্তন ঘটাতে পারি, তাহলে তোমরা অন্তর্হিত হবে আর অন্যদের আবির্ভাব ঘটবে "!

আরও বলছেন যে, ওরা এতোই সূক্ষ্ম যে, কোনও বাধাই ওদের কাছে বাধা নয়.. স্বচ্ছন্দে ওরা সবকিছুর ভেতর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন–

বেশিরভাগ সময়তো সূক্ষ্মতেই থাকি।

আবার বলছেন, ideas have form.. আইডিয়া ধরার চেষ্টা কর। আইডিয়া নস্ট হয় না।

এইগুলো সব স্থূলদেহে অবস্থানরত ব্যাক্তিদের বক্তব্য।

স্বামীজী আবার বলছেন.. I am a voice without a form!

অদ্ভুত কথা বার্তাসব।

আবার দেখি, মহেন্দ্রনাথ তাঁর "সংগীতের রূপ "গ্রন্থে বলছেন.. রাগগুলোর form বা রূপ আছে।

এক্ষেত্রে ব্যাক্তি ছেড়ে বিষয় প্রাধান্য পেল।

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: দেখুন স্পন্দন এর সঙ্গে গতির একটা সম্পর্ক সবসময় রয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর Motion বইটিতে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটু লক্ষ করলেই–গতির সাক্ষাৎ মেলে।

যে কোনো কাজেও, দেখুন 'গতি' আপনা হতেই এসে উপস্থিত।

সশব্দে কাজ হোক বা নিঃশব্দে-- তা, কখনোই গতিবিহীন নয়।

আরও লক্ষ করলে, দেখতে পাবো... প্রত্যেকটা কাজই যেন, এক একটা নকশা!

কাজ কি করে নকশা হতে পারে?

আচ্ছা, কাজ শুরু হল আর শেষ হল –মানে ঠিক কি বুঝবো?

একটা কাজ শেষ হতে ধরা যাক ৩ সেকেন্ড লাগলো,আরেকটা ৪ঘন্টা, অন্যটা ৬৭ দিন আবার কোনটা ৬ বছর... এরকম হয় তো?

কাজ শুরু আর ওই শেষের মধ্যে, নিশ্চই কিছু রূপান্তর সাধিত হচ্ছে।

যদি তা না হতো, তাহলে 'কাজ হচ্ছে', এই কথাটাই প্রযোজ্য হতো না।

রূপান্তর ধরুন :

১) একটা ছোট লোহার বল ছিল –গরম করে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করাতে সেটা চ্যাপ্টা হল।

২)কেউ চা বানাচ্ছেন –বানাবার আগে রসদগুলোর রূপ আর বানানোর পরে... নিশ্চই এক নয়!

৩)কম্পিউটারে দু পাতা লিখলেন.. লেখাগুলোই একটা ছবি বা নকশা হয়ে গেল।

৪)ফোনে কথা বলছেন.. মুখের পরিবর্তন হচ্ছে।

৫)নদীর ওপর ব্রিজ ছিল না.. একটা রূপ আর ব্রিজ হবার পর –আর এক রূপ।

৬)আকাশে প্লেন, একটু আগে ছিল মাটিতে.. ভিন্ন ছবি।

৭) জন্মাবার সময় একরকম দেখতে, মধ্য বয়সে অন্যরকম।

৮)গাছে ফল ছিল না, এখন হল।

কোথায় নয় তবে এবার বলুন যে... নকশা নেই?

এই নকশাকেই মহেন্দ্রনাথ বলেছেন –Curveture!

এই Curveture এর পরিবর্তন –এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবসময় হচ্ছে, অর্থাৎ, নকশা পরিবর্তিত হচ্ছে।

এবার দেখি, যত কম সময়ের কাজই হোক, বা বেশী সময়ের.. পুরো কাজগুলো কি নীরবছিন্ন কাজ, না অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি?

দেখবেন... শেষ পর্যন্ত, আপনি অন্তত –কণা তে এসে পৌঁছে গেছেন।

আচ্ছা তাহলে এই সব পরিবর্তন বা কাজের ভেতরেও কি স্পন্দন রয়েছে?

স্পন্দনহীন কাজ কোনটা?

তাই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র –শ্বাস প্রশ্বাস কেও.. কাজ হিসেবেই ধরে!

স্পন্দন এর সঙ্গে কি শক্তিরও তাহলে কোন যোগ আছে?

শক্তি ছাড়া কি স্পন্দন –উৎপন্ন হয়..

তাহলে, শ্বাস, আসন,প্রাণায়াম, ধ্যান ––এসবও তো কাজ..

একেবারে ঠিক কথা।

সবগুলোই আমাদের ভেতরে নানানরকম পরিবর্তন ঘটায় বা নকশা বদল করে!

স্নায়ুতে কি ওর কোনো প্রভাব পড়ে?

একমাত্র ওখানেই সবচেয়ে বেশী পড়ে।

তাই না মহেন্দ্রনাথ বলছেন.. Vibration, Curveture আর Motion এর পরিবর্তনের ফলে এক বস্তু সম্পূর্ণ অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

সমাজের সঙ্গে বুঝেসুঝেই চিত্র শব্দটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আজকের যা চিত্র.. কালকেরটাও কি এক..

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: শুরু করেছিলাম এক জায়গায়, কিন্তু এখন তো অন্য কোথাও চলে এসেছি বলে মনে হচ্ছে –তাই না?

কিন্তু যা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে,সেক্ষেত্রে এগুলো যে আসতে বাধ্য।

দেখুন, একদিক থেকে আমরা অন্তত ভাবগত দিক থেকে পরস্পর ভিন্ন, অর্থাৎ, কিছু বিশেষ ভাবের বিকাশ একজনের ক্ষেত্রে যা, অন্য জনের ক্ষেত্রে সেটা সামান্য হলেও আলাদা।

দেখতে SIM কার্ড গুলো এক, কিন্তু নম্বর ভিন্ন, এটা অনেকটা এইরকম।

স্পন্দন নেই, ভাব বা ভাবের প্রকাশ আছে –এমন কি হতে পারে?

হয় না।

ভাব আছে, কিন্তু গতি বা Motion নেই, এরকম?

এটাও হয় না।

আপাতত গতিহীন কোনও ভাবকে মনে হলেও, হিডেন ফোল্ডার এর মতন, সে রয়ে গেছে ––সমস্ত তথ্য বা চরিত্র পেটের মধ্যে পুরে।

স্পন্দন রয়েছে মানে কি, ধরা ও ছাড়ার মতন ক্রিয়া সবকিছুতেই চলছে, মানে ধরুন ওই সব ভাবগুলোর মধ্যে চলছে?

অবশ্যই চলছে।

এরকম বেশকিছু ভাব দিয়ে যদি একটা ভাব দেহ গঠন করা যায়,সেখানেও কি এই --ধরা ও ছাড়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে?

নিশ্চিতরূপে থাকবে।

কীসের এই ধরা ছাড়া,অন্তত এই স্থূল জগতে -স্থূল দেহের ক্ষেত্রে?

কেবলমাত্র বায়ুর,আপনারা সকলেই জানেন।

কিন্তূ ওই সূক্ষ্ম ভাবদেহতে কিভাবে বায়ুর ক্রিয়া চলতে পারে?মানে শ্বাস-প্রস্বাসের মতোন ক্রিয়া?

অবশ্যই পারে আর সেটির প্রমাণ ও আছে!

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ৪

সবই হাওয়ার খেলা!

তাই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে 'মরুৎ','পবন' ইত্যাদি ভাবের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথের Motion বই কে থিওরি আর Mentation বইটিকে প্রয়োগ ধরে নিলে, সবকিছু বুঝতে ও শুভফল পেতে অনেক সুবিধে হয়ে যায়।

Motion মানে গতি, এ আমরা সবাই জানি।

আবার হাওয়ার গতি, এমন কথাও বলি।

গতি আছে মানেই.. বায়ু থাকবেই।

বদ্ধ বায়ু আর মুক্ত বায়ু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে আমরা সহজে সিদ্ধান্তে আসতে পারবো।

১) ধরুন একটা বেলুন কে বায়ুপূর্ণ করা হল, এতে বেলুনের আকার বৃদ্ধি পেল আর ওই হাওয়াটা যদি একটু নাম পরিবর্তন করে একটা বিশেষ ধরণের গ্যাস হয়... তাহলে বেলুন কে ছেড়ে দিলেই ওপরের দিকে উঠে গেল!

২) আগেকার একোর্ডিয়ান শব্দযন্ত্রে যখন একটা হাতে বেলো করা হয় আর এক হাত দিয়ে রীড টিপে বাজানো হয়.. তাতে ওই বেলো করার অংশে 'হাওয়া'কে অদ্ভুতভাবে চালনা করা হয় আর সুর বেরিয়ে আসতে থাকে!

এক্ষেত্রে বেলো অংশের সংকোচন ও প্রসারণের পর্যায়টা লক্ষণীয়।

৩) একটি মানুষের দেহ কে যদি বিশেষ ভাবে বায়ুপূর্ণ করা যায় তাহলে কি ঘটতে পারে?

প্রাণায়াম ক্রিয়ায়, কিছু গভীর শ্বাস নেবার কথা বলা হয়, তাও যথেষ্ট সতর্ক হয়ে বা জেনে নিয়ে।

এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তূ মনকে বায়ুপূর্ণ করার কোনো সীমা নেই।

মন কে কীভাবে বায়ুপূর্ণ করা সম্ভব?

এটাই তো মহেন্দ্রনাথের স্নায়ু দর্শন।

সুপ্ত স্নায়ু যত জাগ্রত হবে, ততই বায়ুপূর্ণ হতে থাকবে।

এই সব স্নায়ু নিয়েই আমাদের মন।

এই মনের কোনও সীমা নেই।

মন = মহাশক্তির আধার।

আণিমা,লঘিমা সিদ্ধি.. এইসব নিয়েই.. এগুলি লাভে কৃতিত্ব কিছুই নেই।

ব্যোম পথ মানে, আকাশে প্লেনের এয়ার রুটের মতন।

প্লেন হাওয়ায় যাতে ভাসতে পারে, সেই ভাবেই ডিজাইন করা হয়।

মনও ওই ভাবে ভেসেই রয়েছে, যেহেতু দেহের তুলনায় হালকা।

Mentation মানে একদিক থেকে ধৈর্যের পরীক্ষা।

মহেন্দ্রনাথের ওই Mentation বইটি.. পরীক্ষার সিলেবাস!

[07/11, 2:14 pm] Sanjay Ghosh: ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র = অতি গভীর বিজ্ঞান শাস্ত্র... কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা ভাবলে স্তভিত হয়ে যেতে হয়!

ক্ষিতি,অপ,তেজ, মরুৎ ও ব্যোম... ৫ টি একের পর এক স্তর।

মরুৎ অর্থে বায়ু।

ব্যোম অর্থে শুন্য।

ব্যোম পথে যাতায়াত, মানে অবশ্যই কোন কিছুর যাতায়াত বোঝায়।

এই তত্ব প্রকাশ করেছেন মানুষ,অতএব, স্বচ্ছন্দে আমরা এক্ষেত্রে মানুষের যাতায়াত ধরে নিতে পারি।

সে কেমন মানুষ?

এই স্থূল দেহধারী মানুষ, না অন্য কোন প্রকার মানুষ (!)

বাউল সাধক গান করেন না... এই মানুষে, সেই মানুষ আছে?

তাহলে, কি আমাদের মধ্যে অন্য কোন ধরণের মানুষও লুকিয়ে রয়েছে?

মনে হয় নিশ্চিতভাবে রয়েছে।

একটা রকেট দিয়ে একটা স্যাটেলাইট কে কোনও কক্ষে, যা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত –সেখানে প্রেরণ করা হল, কিন্তু রকেটটার একটার পর একটা স্তর জ্বলে শেষ হয়ে গেল, তাই না?

কিন্তু ওই স্যাটেলাইটটা বেঁচে রইলো।

মানুষের স্থূলদেহ চলে গেল, কিন্তু ভাবদেহ বেঁচে রইলো।

স্পন্দন ছাড়া কি বেঁচে থাকছে?

কোনোমতেই না।

স্পন্দন এর ক্রিয়া কি বায়ুহীন, অর্থাৎ, মরুৎ হীন অবস্থায় হতে পারে?

কোনভাবেই পারে না।

তার মানে কি ওই লিঙ্গদেহ বা ভাবদেহ বা সূক্ষ্ম দেহতেও কি নেওয়া-ছাড়ার ক্রিয়া চলে?

নিশ্চই চলে।

এটাকে কি শ্বাস- প্রশ্বাস বলা যায়?

কেন যাবেনা..

তাহলে তো বলতে হচ্ছে আর প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে যে,সূক্ষ্ম দেহও শ্বাস নেয়?

নিশ্চিতভাবে নেয় আর সেইজন্যই সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছে।

মহাকাশে,মহাশুন্যে... মানুষ কি শ্বাস না নিয়ে বেঁচে রয়েছে?

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ৫

ইচ্ছায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রেরণ!

কি এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ?

এটি বিশ্লেসন করলে, মূলত তিনটি বিষয় পাচ্ছি :

১) আধ্যাত্মিকতা

২) তরঙ্গ

৩) প্রেরণ পদ্ধতি

সরল ও সোজাসুজি কথায় আসি –

আধ্যাত্মিকতা আসলে আমাদের বেশ কিছুটা গভীর মনের গল্প শোনায়।

এই গল্পের একটা উৎসও আছে।

এ এমন গল্প.. যা শুনতে শুনতে নেশা হতে শুরু করে, ক্রমে নেশা গাঢ় থেকে আরও গাঢ় হতে থাকে আর শেষে জ্ঞান হারিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে চৈতন্য সাগরে পড়ে যায়!

এতে দুটো ব্যাপার পাশাপাশি চলে..

ক * একের পর এক ভাব-চিত্র মনের মধ্যে উঠতে থাকে।

খ* আচ্ছন্ন অবস্থা মানে ধীরে ধীরে নেশা হতে থাকে।

আসলে আমাদের স্নায়ুগুলির ভেতরে বেশ ভালোরকম মদিরা রাখা আছে!

তাই কোনও একটা পন্থা অবলম্বন করে, ওই স্নায়ুর ভেতর ঢুকতে পারলেই –মদিরার দিব্য গন্ধ আসতে থাকে আর বেশ পান করতে বেশী ইচ্ছা জাগে।

আস্তে আস্তে দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হতে শুরু করে আর এদিকে টনটনে জ্ঞান বলতে শুরু করে... আরে বিনা পয়সায় যখন পাচ্ছ, আরও খাও, আরও খাও।

ব্যাস, এবারে তো লাগাম ছাড়া অবস্থা!

এই ভাবে স্থূল স্নায়ুর আধার, মানে দেহজ্ঞান ছেড়ে সূক্ষ্ম স্নায়ুর আধার –মনের বা ভাবের অন্দরে প্রবেশ.. ফলে নানান দর্শন।

এরপর তো নেশা জমে গেছে আর কাউকে বিশেষ দেখতেও ইচ্ছে নেই, শুধুই নেশার পিপাসা!

বেশী আর রূপ টুপ্ এবার নেই রূপের মোহ কেটে গিয়ে আরও এক একেবারে অজানা কিছু যেন দেখতে পেয়েছে।

আরে ওইসব রূপগুলোর গঠন,এইসব দিয়ে হয়েছে?

এতো একেবারে নজর কাড়া ব্যাপার...

এরকম সব অদ্ভুত রশ্মি, এতো সব জ্যোতির্ময় রং, কি এক অজানা অসম্ভব শব্দ যেন, আরে এ কিরকম আলো..এতো অন্যরকম.. জ্যোতিতে জ্যোতিতে ছয়লাপ।

ওই দূরে কোথা থেকে সব যেন উঠছে –অবাক কান্ড!

কোথায় ওই মাতাল এখন?

কারণ স্নায়ুমন্ডলীর ভেতর।

ব্যাস আর সামলাতে পারেনি... টলতে টলতে যেই আরও একটু কোনোমতে এগিয়েছে –একেবারে বেঁহুস!

যখন জ্ঞান ফিরল.. আর তো কিছুতেই ওই সব ব্যাপার ভুলতে পারছে না।

সঙ্গে যেন কিছু সুগন্ধিও মেখে এসেছে.. ভুর ভুর করছে গন্ধ, মেজাজটাও বেশ বদলিয়ে গিয়েছে, মানে কি ভেবে যেন ভেতরে ভেতরে মশগুল।

বেশ এখন বুঝতে পারছে, তার মানে বাজে কথা নয়, সত্যিই তো হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম.. ওই জায়গা আছে।

কোন জায়গা?

নিজের মধ্যে নিজের!

এটা আধ্যাত্মিকতার প্রথম সংজ্ঞা...

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা..৬

অনেকেই হয়ত ভাবছেন যে, এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আবার 'বেতার' শব্দটাকে কেন জোড়া হল, তাই তো?

জোড়ার কিছু কারণ আছে।

অল্পকথায় বলতে গেলে, যেখানে সাধারণভাবে চোখে কিছু দেখা যাচ্ছেনা বলে আমাদের মনে হয়, অথচ দূরে কিছু কাজ হচ্ছে.. এইসব ব্যাপার কে আমরা কিছুটা বেতারের মাধ্যমে হচ্ছে বলে ধরে নিই।

কিন্তূ এই 'বেতার' বিষয়টার গভীরতা নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়।

যা আমরা জানি না, সেসব ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি যা জানা আছে, সেখানেও –বেতার, অলক্ষে যে সবসময় কাজ করছে... এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত আধ্যাত্মিকতা এমন এক বিষয় –যা উষ্ণমাত্রার এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যাক্তিই বুঝতে সক্ষম।

তাঁরা আবার নানান মাত্রার আধ্যাত্মিকতার পরিমাপেও সক্ষম!

এই যে নানান মাত্রা, এ শুধু নানান তরঙ্গ ছাড়া কিছুই নেই।

কার ভেতর কি রকম তরঙ্গের প্রকাশ তাঁরা তা বুঝতে সক্ষম।

এই তরঙ্গ রয়েছে মানেই, এর বিস্তার ও রয়েছে।

এবার প্রশ্ন, কি দিয়ে এই তরঙ্গের সৃষ্টি হয়?

এক কথায় উত্তর.. শক্তি দিয়ে।

আধ্যাত্মিক তরঙ্গ বলা হচ্ছে কেন?

কারণ এটা ব্যাক্তিবিশেষের মনেই সৃষ্টি হয় আর ওই মন থেকেই বাইরে প্রবাহিত হতে থাকে।

বাইরে যখন প্রবাহিত হয়, তখন জলের তরঙ্গের মতন, এটা দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তূ অভিজ্ঞ ব্যাক্তি এটা দর্শনও করতে সমর্থ।

এই দর্শন –আমাদের স্থূল চোখের দর্শন নয়।

এই তরঙ্গের এফেক্ট বা প্রভাব কিন্তূ অনেকেই অনুভব করতে পারেন।

বহু দূরেও অবস্থান করেও, সম্পূর্ণ আপাতভাবে "বিনা তারে বা বেতারে"–এই অনুভূতি লাভ হতে পারে।

কোলকাতার কোন ব্যাক্তির তরঙ্গ নিমেষে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মহেন্দ্রনাথের তো মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিলো, তা তো ওনার নিজের উক্তি থেকেই প্রমাণিত (পূজনীয় শিবদাস মুখোপাধ্যায় এর মহাযোগী মহেন্দ্রনাথ গ্রন্থ)।

আরও বলছেন মহেন্দ্রনাথ এইভাবে, যার ছাতার বিস্তার যত বড় হবে, তার ভেতর ততো বেশী লোক আশ্রয় পাবেন।

সবটাই কিন্তু তরঙ্গের ক্রিয়া।

এই পর্যায়ে আমরা বিশেষ কয়েকটা তরঙ্গ নিয়ে কিছু আলোচনা করবো :

১) শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ।

২) নৃত্যর তরঙ্গ

৩) সংগীতের তরঙ্গ

৪) কাব্যের তরঙ্গ

৫) মহাজাগতিক তরঙ্গ

৬) ভ্রমণ তরঙ্গ

পাশাপাশি আমরা আরও একটি বিষয় কেও রাখবো... চিত্রের মাধ্যমে তরঙ্গ চর্চা!

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা..

৭

শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ –

এই ব্যাপারটা কিরকম?

ইন্টারনেট অন করে রেখে দিয়েছেন, কিন্তু কোনও তথ্য পাচ্ছেন না, বা দেখছেন না এইরকম ব্যাপার।

মানে সহজ কথায় –আপনার সঙ্গে সার্ভার এর যোগস্থাপনা হয়ে গেছে,এই মুহূর্তে আপনি সারা বিশ্বের সঙ্গে তরঙ্গের মাধ্যমে যুক্ত।

এই তরঙ্গ মিলিমিটার বা মাইক্রোমিটার দৈর্ঘ্যের হতে পারে।

আজকালকার ভাষায় এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির পরিভাষায় একে Mbps বলা হয়।

ওই M হল ধরুন মেগা মানে, ১০ এর ওপরে ৬ পাওয়ার।

এরপর বিটস পার সেকেন্ড।

বিটস মানে, বাইনারি ডিজিটস।

অর্থাৎ ওই ওতো বাইনারী সংখ্যা যা কিনা কেবলমাত্র ০ ও ১ এর মাধ্যমে গঠিত, এটা ঠিক তাই।

আমরা যত কথা শুনি বা শোনাই, ছবি দেখি বা দেখায়, ওসব এই দুটি সংখ্যা বা ডটস এবং নো ডটস অথবা বিন্দু ও বিন্দু নয়... এই ভাবের ভিত্তিতে গঠিত।

এই ক্ষেত্রে আমরা কথা বা ছবি কিছুই আদান প্রদান করছিনা বা বলা ভালো কোনও App বা এপ্লিকেশন ব্যবহার করছি না, শুধু যুক্ত রয়েছি জালটির সঙ্গে অর্থাৎ নেটের সঙ্গে।

কি ঘটবে?

আপাত দৃষ্টিতে কিছুই ঘটবে না।

কিন্তূ ওইরকম ধরুন আপনি বিশ্বজোড়া একটা জাল বিস্তার করে ফেললেন প্রথমে।

তারমানে একটা মাকড়সার মতন একটা জাল বিভিন্ন দিক থেকে ছুঁয়ে রইলো, তা সে দেওয়াল, দরজা যাই হোক।

আমি বা আপনি ওই জাল কে কোনই বিশেষ কাজে লাগাতে পারব না, কিন্তু মাকড়সা সহজেই ওর ভেতর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে।

এটাও অনেকটা সেইরকম।

আপনি একটি বিশেষ তরঙ্গ, যা অতি অতি সূক্ষ্ম, তা তৈরী করেছেন, নিজের ভেতর সুপ্ত স্নায়ু জাগিয়ে জাগিয়ে ধীরে ধীরে পরিশ্রমের মাধ্যমে।

এবার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করলেন... জগতের সব মানুষের মঙ্গল হোক আর ভাবলেন ওই চিন্তা চতুর্দিকে আপনার মাধ্যমে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে–ব্যাস এইটুকু করলেন।

না শোনালেন কোনও গানবাজনা বা দেখালেন কোনও ছবি।

এতে কি কোনও কাজ হয় বা লোকে উপকার পায়?

স্বামীজীর রাজযোগ অনুসারে নিশ্চই পায় আর মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে ওই তরঙ্গ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে... যা শুধু মানুষকে প্রভাবিত করে না, করে স্থাবর জঙ্ঘম, তাবৎ প্রকৃতিকে।

প্রকৃতি-প্রকৃতি তে মিলন হয় না.. হয় পুরুষ আর প্রকৃতিতে!

তাই পড়ার অনুরোধ মহেন্দ্রনাথের:

১) ব্রজধাম দর্শন

২)নিত্য ও লীলা

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ৮

আমরা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তার আলোচনায় ছিলাম।

এতে কি হয়?

সত্যি কথা বলতে কি ভক্তিভাব প্রবল হয়।

কিছু পেয়ে পেয়ে পূর্ণ যেমন একদিকে হচ্ছি আবার যেন কিছু দিয়ে দিয়েও আনন্দ পাচ্ছি।

কখনো কখনো আনন্দে -ছেদ।

খুব বিড়ম্বনা আর পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা।

মনে হয় এই করতে করতে ভক্তি পাকা হতে থাকে আর ভক্তির নানান মাধুর্য ও মহিমা বুঝতে সাধক বা সাধিকা সক্ষম হন।

কালে পারদর্শী বা পারদর্শীনি হয়ে ওঠেন।

মহেন্দ্রনাথ মূলত তাঁর "ব্রজধাম দর্শন" ও "নিত্য লীলা"গ্রন্থে এই ভক্তিরস সাগরের নানান অভিব্যাক্তি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তিনি বল্লভ কে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন রসের পরিচয় সুকৌশলে সামনে এনেছেন, এতে মধুর থেকে বাৎসল্য –কিছুই বাদ পড়ে যায় নি।

অমৃতক্ষরণ থেকে বিরহের উদ্ভাস তিনি অতি নিপুণ ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন।

সঙ্গে যুক্ত করেছেন স্থানমাহাত্মও!

একজন দিয়ে পরিপূর্ণ আর একজন নিয়ে... ভাব মূর্তিকে জাগ্রত করেছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন রূপক চিত্রে,চরিত্রে ও প্রচলিত মূর্তিতে।

যদিও এই পর্বগুলি, তাঁর পর্যটনের অঙ্গ হিসেবে বিশেষ স্থান ও গুরুত্বলাভ করেছে, কিন্তু অন্যত্র দক্ষিনেশ্বরের মাতৃমূর্তি থেকে নির্গত জ্যোতির ধারাও,তিনি সমান শ্রদ্ধায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাদ দেন নি... কঙ্খলের নুড়ি পাথরকেও!

আর আহিরীটোলার বিশাল বুড়ো শিবের দর্শন তো তাঁর লেগেই থাকতো।

ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে নিত্য গমন আর.. আপনি তো বৈদান্তিক, এখানে আসা কেন?, এই প্রশ্নের সম্মুখে.. তাঁর উত্তর, মহামায়ার মায়া তো জানোনা –ঘুরিয়ে আছাড় দেয়!

সবকিছুতেই বিশ্লেসন, গ্রহণ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ।

সাজুজ্জ থেকে স্বাস্ঠি প্রতিটি স্তর কে সযত্নে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর বিজ্ঞানরসে স্নিক্ত করে।

অর্থাৎ প্রচলিত ভক্তিধারা কে বিন্দুমাত্র অস্বীকার তো করেনই নি, উপরন্তু জাতীয় ভাবের মর্যাদা প্রদান করেছেন।

সেই একই মহেন্দ্রনাথ কিন্তু রচনা করলেন তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ.. Homocentric Civilisation!

এখানে কেন্দ্রে মানুষ আর পরিধিতেও মানুষ... অন্যকোন প্রচলিত দেব বা দেবী মূর্তি নেই।

ঠিকমতন দেখলে.. এটি তাঁর পূর্বের বই দুটির –উল্টোপিঠ।

শুধু তাইই নয়.. ভবিষ্যতের কেন্দ্র হিসেবে শিলমহর লাগিয়ে দিয়েছেন, এই মানবকেন্দ্রিক সভ্যতার ওপর।

কিন্তু এসবে বেতার কোথায়?

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ৯

Homocentric Civilisation যেখানে কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান.. সেখানে আবার আধ্যাত্মিকতা কোথায়?

জীবন্ত মা দুর্গা যদি হন.. তাহলে জীবন্ত আধ্যাত্মিকতাই বা হবে না কেন?

একেবারে তাজা আধ্যাত্মিকতা –সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে লাভ করা আর সেই অর্থেই স্বামীজী শ্রী শ্রী ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন –লেটেস্ট, একঘেয়ে নন।

আর মহেন্দ্রনাথ?

আগামীর কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিয়েছেন.. শ্রী শ্রী ঠাকুরকে।

আর স্বয়ং ঠাকুর কি বলছেন?

"এখানকার সব দরজা খোলা"!

ভাবা যায়?

যত মত –ততো পথ।

কৈ কোনোটাই তো দেখতে পাচ্ছি না..

শুধু কিছু ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহেন্দ্রনাথের বই পড়ুন আর ওঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকুন... আস্তে আস্তে সব দেখতে পাবেন.. সম্পূর্ণ বেতারের মাধ্যমে!

আপনার এতদিনের জানা আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা বদলিয়ে যেতে বাধ্য।

বোঝা যায়, কিছু গোঁড়া জাতের মানুষ –ওনাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন, ভাবেন ওই যা প্রচলিত ব্যবস্থায় জেনেছেন... ওতেই সব আছে।

এসব যেন ম্লেচ্ছদের সব কি না কি.. ওসবে আবার কি হবে?

হ্যাঁ, এসবের ধারণা আমাদের আশা করি সবারই অল্পবিস্তর আছে।

Homocentric Civilisation কে একটু বিস্তারিত করলেই, ওর ভেতর থেকে আস্তে আস্তে চোখের সামনে জ্বলে উঠবে মহেন্দ্র নাথের –

১) Toilers Republic

২) Society

৩) New Asia

একের পর এক!

উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থস

থাকবে বক্তব্য আর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়বে এক আলোড়ন... এ আলোড়ন দীর্ঘস্থায়ী।

এ আলোড়ন মানুষকে অন্য লোকে নিয়ে যায়।

সুমহান অন্তর
ঐশ্বর্যের সন্ধান প্রদান করে।

নিজের ভেতর আলো জ্বালাবার সব চাবিগুলো দিয়ে দেয়।

মাতিয়ে দেয়, নব কর্ম প্রেরণায়।

চলতে শুরু করে ধীরে ধীরে মানুষ তার লক্ষ্যের দিকে।

সে নিজের শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়!

যত মহেন্দ্রনাথের স্নায়ু-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়.. ততই শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে আর পরিচয় হয় নানান অজানা ভাবের সঙ্গে।

বুঝতে পারে.. নব রামকৃষ্ণ বেদান্ত কি..

ঠাকুর তাঁর নিজের উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে... আগের আগের প্রচলিত মহাজনদের উপলব্ধির সীমা লঙ্ঘনের কথা নিজের মুখে বলেছেন।

কি সেই সীমা লঙ্ঘন... এবার তা অনুভবে আসবে।

মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

সব কিছু সংগঠিত হবে.. বেতারে!

যারা পিছনে পড়েছিল, তাদের দেখা যাবে সামনের সারিতে।

স্বামীজীর ভাষায়.. মূর্খ পন্ডিতের গুরু হয়ে যাবে!

মুখ দিয়ে বেদ বেদান্তর বাণী –আপনা হতেই বেরোবে।

এরপর তো আরও অনেক আছে..

শ্রী শ্রী মা এই ধরাধামে যবে থেকে এসেছেন, সেই সময় থেকেই, সারা বিশ্বে নারীদের মধ্যে এক বিশাল জাগরণের সূচনা হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে তুলে ধরলেন..

"নারী অধিকার"বইটি রচনা করে।

সবকিছু মানুষ নিয়ে!

সর্বস্তরের সব মানুষের মধ্যে যে মহাশক্তি সুপ্ত হয়ে ছিল... তা জেগে উঠেছে... এই নতুন যুগ, নতুন করে পথ চলা.. আধ্যাত্মিকতা অর্জন করার লক্ষ্যে নয়, পরন্তু চরম সীমাহীন আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ভাব সমীপে!

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১০

যদি এক বড় মুখের পাইপ এর ভেতর দিয়ে তোড়ে ভালোবাসা আর শক্তি বেরিয়ে এসে আমাদের ওপর পড়ে –তাহলে কেমন হয়?

মজার ব্যাপার ওই পাইপ, শক্তি আর ভালোবাসা কোনোটাই কিন্তু চোখে দেখতে পাওয়া যাবে না।

খারাপ লাগবে, না আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাবো?

মনে হয় পরেরটাই।

বলা কি তাহলে সঙ্গত হবেনা যে–

আধ্যাত্মিকতা = পরম আনন্দ আর অসীম শক্তি..

কিছুই তো দেখা গেল না, কিন্তূ তার মানে কি অনুভব হয় নি?

তাও তো নয়!

এটাই মনে হয় আধ্যাত্মিকতার সামান্য একটা উপমা।

সৎ, চিৎ আর আনন্দ.. এতো বহু পুরোনো আপ্ত বাক্যই বলা যায়, কিন্তূ সবমিলিয়ে কি অন্তর্নিহিত অর্থ আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায় না?

দেখা যাচ্ছে না, তার মানে কি অনুভবে ছেদ পড়েছে... তাও তো নয়।

তাহলে কি বেতারের মাধ্যমে হচ্ছে, একটু হলেও কি বলা যায় না?

মনে হয় যায়।

এটা যথাসম্ভব মনে হয় শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা।

একটু রঙ বা ভাব মেশালেই..

হয়ে যাবে নৃত্যতে আধ্যাত্মিকতা, সংগীতে আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি।

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১১

স্পন্দনের বিশ্লেসনে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ব বেরিয়ে আসে।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই স্পন্দন তত্বর অভূতপূর্ব সব কার্যকলাপ দেখে –বিশ্ব জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনের গতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ আমাদের অন্য এক মানসিক স্তরে উন্নীত করবে।

এর ফলে অনেক শারীরিক দুর্যোগের হাত থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।

অতি সীমিত আমাদের এই জ্ঞানের পরিধি উধাও হয়ে, এক অতি বৃহৎ জগতের দর্শনলাভ সবার হবে আর আমরা নানান নিত্যনতুন প্রেরণাপূর্ণ কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে ধন্য হয়ে যাবো।

এই Vibration বা স্পন্দন তত্ব যে কত গভীর ও বিস্তৃত তা ভাবতে গেলে পরমআশ্চর্য হয়ে যেতে হয়!

এই স্পন্দন যখন ধীরে ধীরে অতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন বিশ্ব জগৎ পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়।

এর মানে হল, এই পরিচিত জগতের খোলসের ভেতর থেকে নতুন নতুন জগৎ বেরিয়ে আসতে থাকে... কোনও অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার নয়.. পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক।

এসব জগৎ, আমাদেরই মনের নানান উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরমাত্র!

এই সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান আমাদের স্নায়ুতে।

প্রকম্পিত হতে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুসকল আর তারই মিলিত ফল–এই নতুন নতুন জগৎ বা বলা ভালো, ভাবজগতের দর্শন লাভ।

যে পরিচিত জগতে আমাদের বসবাস, সেটাও একটা বিশেষ স্পন্দনমাত্রার ভাবজগৎ ছাড়া কিছুই নয়।

আপনারা জানেন, স্পন্দন যত সূক্ষ্ম হবে, তার তীব্রতা ততই বেশী হবে, অর্থাৎ, তা প্রভূত শক্তিশালী হবে এবং বিস্তারলাভ করবে অনেক বড় পরিধি নিয়ে, এমনকি বহু বহু দূরে অবস্থিত গ্রহ –তারকদিকেও তা আলড়িত করতে একান্তই সক্ষম।

এই প্রসঙ্গে বলি, এই মানুষ নামধারী যন্ত্রগুলি সব অসাধারণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী।

এর ধরা যাক, অপারেশনাল ম্যানুয়াল হারিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর ওই ম্যানুয়াল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়াছেনই শুধু নয়, সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে, প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

মানুষ কি করে মানুষের সব কলকবজা ব্যবহার করতে পারে, তা এই যুগে একেবারে পূর্ণরূপে ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই অর্থে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যারা সকলেই একেকটি বিশেষ কার্যপ্রদর্শনের যন্ত্র!

এই মনুষ্য–যন্ত্রগুলি আরও বহু বহু মানুষকে ক্রমান্নয়ে, এই অভুতপূর্ব শিক্ষাদান করে চলেছেন।

এই সব উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের মধ্যে.. পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ অন্যতম!

ছোট একটি পরীক্ষাসহ উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি।

স্বামী সুবোধানন্দ যখন রাঁচিতে থাকতেন, তখন ওই দুপুরের দিকে কেউ গেলে দেখতে পেতেন, তিনি ওই ওনার একটা হাত মাথার নিচে রেখে শুয়ে আছেন।

ওনাকে বালিশ ব্যবহারের কথা বলা হলে উত্তর দিতেন.. কত কতদিন তো ইটের ওপর মাথা রেখে কাটিয়েছি, ও আমার তাই এরকম করে শোয়া অভ্যাস হয়ে গেছে.. বালিশ লাগবে না।

এবার বলি, যদি ওই ইঁটের মতন, মহেন্দ্রনাথের বই আমরা মাথার নিচে বালিশের মতন রেখে শুই বা নিদেনপক্ষে ওনার বই কিছু পাশে রেখেও শুই, তাহলেও নিশ্চিতভাবে দ্রুত ওনার ভাবের স্পন্দন, যা অতি সূক্ষ্ম.. আমাদের ভেতর প্রবেশ করবেই করবে.. এ নিশ্চিত!

তিনি সর্বতভাবে, ওই ছাপার অক্ষরগুলির ভেতর অবস্থান করছেন আর আমরা ওই ছাপার অক্ষরের সোজাসুজি স্পর্শলাভ করলে... ক্রমে যে তাঁকে অনেক বেশী করে লাভ করবো, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা..

১২

আজকের প্রসঙ্গ সংগীতে আধ্যাত্মিকতা।

আপাত আনন্দ থেকে –আসল আনন্দে কীভাবে আমরা পৌঁছোতে পারি, এই ভাবের সাধনগুলি আমাদের সেটাই করতে শেখায় আর এতে সিদ্ধিলাভ ও করা নিশ্চিতভাবে যায়।

মহেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীতের মহাসাধক মহামান্য হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমে গিয়েছিলেন,অন্তত তখনো পর্যন্ত মাটির কিছু নিচে অবস্থিত, সেই আশ্রম ছিল এবং সাধকরাও ছিলেন!

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগীতের সাধকরা, বছরে কয়েকদিন, বিশেষভাবে একদিন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ওই আশ্রমে উপস্থিত হন এবং সংগীত পরিবেশন করেন।

নিশ্চই বলার প্রয়োজন নেই, পুণাত্মা হরিদাস গোস্বামী কে ছিলেন..

সবাই জানেন উনি প্রখ্যাত তানসেন এর গুরু ছিলেন।

রাজদরবারে তানসেন নিত্যদিন সংগীত পরিবেশন করে থাকেন আর সভাসদরা বিভোর হয়ে, সেই সংগীত শোনেন, সর্বত্র তাঁর এই অসাধারণ সংগীতের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন রাজা শিকারে বেড়িয়েছেন, বেশ কিছুটা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার পর রাজা যেন দূর থেকে কোনো অদ্ভুত সংগীতের ধ্বনি শুনতে পান।

তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে, ওই ধ্বনির দিকে চলতে শুরু করেন, অনেকটা আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশের পর, উনি দেখেন এক ব্যাক্তি বিভোর হয়ে ওই সংগীতের সঙ্গে যেন মিশে গেছেন আর অদ্ভুত অজানা এক আনন্দের স্রোত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি আরও এগিয়ে দেখেন... একি! এতো আমাদের তানসেন, তিনি পরম আশ্চর্য বোধ করেন।

বহু পরে সংগীত সাঙ্গ হয়, রাজা তানসেনের সমীপবর্তী হন অতি সতর্কতার সঙ্গে–উনি দেখেন তানসেন তখনও ঠিক প্রকৃস্থিস্ত নন, এরও কিছুক্ষণ পরে তানসেনের স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে.. দুজনে দুজনকে দেখে এক অবাক করা আনন্দের সাগরে মগ্ন হন।

রাজা জিগ্যেস করেন... আপনার এই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে, এই অসাধারণ সংগীত পরিবেশনের হেতু কি?

এ সংগীত তো কখনো রাজসভায় আপনি পরিবেশন করেন নি...

উত্তরে তানসেন বলেন, মহারাজ আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার রাজসভার একজন সংগীত শিল্পী আর আমি আপনারই অনুগ্রহে জীবনধারণ করে থাকি।

ওখানে আপনার গুণগ্রহী সভাসদবৃন্দ ঠিক যে ধরণের সংগীতের সমজদার, আমি ঠিক তাই পরিবেশন করে থাকি।

এই যে সংগীতে আপনি আমাকে এখানে পরিবেশন করতে শুনলেন... ক্ষমা করবেন, এতো শুধু স্বয়ং ঈশ্বর কে শ্রবণ করাবার নিমিত্তে... এ যে এইরূপ বনানী বা অরণ্য বা অনুরূপ কোনো স্থান ছাড়া উত্থিত হতেই পারবে না মহামান্য মহারাজ!

রাজা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন শুধু নির্বাক হয়ে ওনার দিকে।

অনুরোধ জানাই সবাইকে অন্তত মহা সঙ্গীত সাধক ও সঙ্গীত-বিজ্ঞানী ঋষি শ্রাঙ্গ দেবের গ্রন্থ, যা এখনো পাওয়া যায়, সেটা অল্পবিস্তর পাঠ করার জন্য।

নাদের সাধনা যে কি, সেইদিকে কিছুটা হলেও আমরা একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করে দেখবো, অন্তত অল্প হলেও জ্ঞানের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ নাদের বিষয়ে যে গভীর আলোচনা বিভিন্ন ওনার রচিত বইতে করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই পর্যায়ে তাই ওনার দুটি বইয়ের ওপর আলোচনা ও আলোকপাতের প্রয়াস থাকবে।

১) Theory of Sound

২) সংগীতের রূপ

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১৪

স্বর সাধনা যেহেতু এই সংগীতে আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ অঙ্গ, তাই স্বর, ধ্বনি, স্নায়ু, কুন্ডলিনী শক্তি.. এই সবগুলোর সম্পর্ক সম্মন্ধে জানতেই হবে।

"সঙ্গীত রত্নাকর"বইতে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে আর এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, শ্রী অমিয় কুমার সান্যাল, শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায়ের বই এবং লেখালেখির মধ্যে,সংগীতের সঙ্গে স্পন্দনের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে,তা আলোচিত হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথের.. ভাব থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে রূপের সৃষ্টি হয়, এ এক নতুন চিন্তার জগৎ আমাদের সামনে মেলে ধরেছে।

প্রথমে ভাবগুলোকে ধরা যায় না.. রূপ সৃষ্টি তো দূরের কথা!

কিন্তূ কি উপায়ে আমরা এগোতে পারি আর সফলও হতে পারি,তার হদিশও উনি দিয়েছেন।

ওনার 'Devotion'বইটা এই বিষয়ে খুব কার্যকরী হবে আর সঙ্গে 'Mentation'তো আছেই।

সোজা কথা, কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমরা একাগ্রতা বাড়াতে পারি আর আমাদের ফোকাস কে সুদৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে পারি, তা সহজ করে ধাপে ধাপে উনি বুঝিয়েছেন।

মাছির মতন এলোমেলোভাবে কণারা ঘোরাঘুরি করছে, কিছুতেই ওদের স্থির করা যাচ্ছে না।

কেন পারা যাচ্ছে না?

আমাদের একাগ্রতার অভাব কেবলমাত্র।

তার মানে অধ্যাস এর প্রয়োজন অতি অবশ্যই।

সংগীতের মাধ্যমেও,এই অধ্যাস করা যায়।

তখন ওই কণারা আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না থেকে ক্রমে ক্রমে ঘণিভূত হতে শুরু করবে, স্পন্দনও পরিবর্তিত হবে আর নিশ্চিতভাবে রূপ ধারণ করবে!

সব রাগের নিজস্ব রূপ আছেই আছে, আর এই জন্যই –শাস্ত্রীয় সঙ্গীত.. যন্ত্র সঙ্গীতও এর ব্যাতিক্রম নয়।

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১৩

অন্তরে শব্দ নেই –এমন কোন বস্তুও নেই।

কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে তো?

কিন্তূ শব্দের বা বস্তূর বিজ্ঞান তো তাই বলে!

ভারতীয়রা বহু প্রাচীন কাল থেকে তো বটেই, এমনকি অতি অদ্ভুত আকর্ষণীয় শব্দের হদিশ অল্প হলেও পেয়ে গিয়েছিলো গ্রীস, ইতালির কিছু মানুষ –যারা সত্যিই অনুসন্ধানী ছিলেন।

নাদ থেকে, অর্থাৎ তখন শব্দের জায়গায় –ধ্বনি শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে... সেই মহাধ্বনি থেকে, এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, এর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত।

ওদিকে এই নাদের কিছুটা আভাস পেয়ে মহেন্দ্রনাথ বলছেন, পিথাগোরাস হারমনি, হারমনি বলতে লেগেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, সংগীতের আধ্যাত্মিকতায়, এসব প্রসঙ্গ আসছে কেন?

সঙ্গীত কি শব্দ ছাড়া?

তাই স্বাভাবিক ভাবেই আসছে।

আর যেহেতু এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নিয়ে যেহেতু আলোচনা, অতএব আমাদের তো কিছুটা অন্তত ভেতরে যেতেই হচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতা এক অর্থে পূর্ণতা লাভের অনুভূতি ও জ্ঞান প্রাপ্তি কেই যেহেতু চিহ্নিত করে তাই সংগীতের ভেতর দিয়ে এই অর্থপুর্ণ অনুভূতি যে আমাদের এক অসাধারণ চৈতন্য লোকে অবস্থান করাতে সক্ষম, তা সকলেই বুঝছি।

ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সংগীতের মূল উদ্দেশ্য.... বিভিন্ন স্নায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে, প্রায় আমাদের অজান্তেই.. আমাদের নিয়ে চলা ব্রহ্মলোকে!

হ্যাঁ, এটাই বাস্তব সত্য।

এ একেবারে বহু প্রমাণিত বহুযুগ আগে থেকেই এবং এখনো সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সাধনা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বমহিমায় সক্রিয়!

এই পশ্চিমবঙ্গতে একটি স্থান আছে যা 'মহানাদ'নামে বিখ্যাত, ওই স্থানে পদার্পন করলেই অদ্ভুত স্থান মাহাত্ব অনুভূত হয়।

মহেন্দ্রনাথ যে আমাদের শাস্ত্রীয় রাগগুলোর রূপের কথা বলেছেন এবং তাঁর সুযোগ্য অনুরাগী শিল্পী... সেগুলির চিত্ররূপ দান করেছেন,এ সম্পূর্ণ ভাবে গভীর মনন ও ধ্যান এর অন্তর্গত বিষয়।

স্পন্দনের নানান অবস্থা.. আসাম্য থেকে সাম্য তে এবং পরিশেষে যে নাদ অবলম্বনে পূর্ণ চেতনার ভূমিতে অবস্থান ও অবগাহন.. মহেন্দ্রনাথের Theory of Sound, সেই ঝংকার সহায় ওঁম এর মাহাত্ম আমাদের মানসভূমিকে জাগ্রত করে বিশুদ্ধ চৈতন্নলোকের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা করছে।

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১৫

ঈশ্বর দর্শনের কি ইতি হয়?

অনেকেই বলবেন হয় না।

কিন্তূ যদি বলা যায়,যে 'ইতি' হয়,তাহলে কি মনে হবে..

এ আবার কি করে হওয়া সম্ভব?

কেন?

স্বয়ং ঈশ্বরই তো সবচেয়ে ভালো জানেন,তাঁর সমস্তভাবগুলো সম্মন্ধে আর তিনি তো নিজেই আবার সমস্তভাবসমষ্টি স্বরূপও বটে... তাহলে তো ইতি হচ্ছে!

এবার নিশ্চই বলবেন –সে কি করে হতে পারে,তিনি কি আর মানুষ!

আবার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে,তিনি মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন।

তিনি আবার এই নরদেহ বা মানুষের দেহও ধারণ করে আসেন, এসে আবার "দেখা দাও,দেখা দাও" তাও বলেন.. বেশ মজার ব্যাপার তো!

তার মানে, তাঁরও, ওই দর্শন পিপাসা রয়েছে?

অর্থাৎ, তিনি কতোটা দর্শন করতে পারবেন, কতভাব?

আর যিনি দর্শন করেন, তিনি নিজেই আবার দৃশ্ব হতে পারেন কি?

এটাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

তাহলে ঘটনা কি ঘটে?

তিনি আমাদের জন্যই দেহধারণ করেন, আমরা যেহেতু সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, তাই যথার্থ পথে আমাদের চালিত করবার জন্য এবং যথার্থ দৃশ্ব ও, তিনি আমাদের জন্য নিদৃষ্ট করে থাকেন।

এই যে তাঁর এবং আমাদের মধ্যে বিভাগ.. এটা তবে কেন?

কেবলমাত্র ক্রীড়ার জন্য... এইজন্যই মহেন্দ্রনাথ বলছেন, এই সৃষ্টির কোনো purpose নেই।

শুধুই ক্রীড়া।

। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ.. এও দেহধারী ঈশ্বরের... মা মা আকুতি থেকেই প্রমাণিত হয়।

শ্রী শ্রী ঠাকুর ও মা তাই অভেদ।

আর আমাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কীভাবে হয়ে থাকে?

আপাত দৃষ্টিতে... বেতারের মাধ্যমে!

আর এই যোগাযোগ এর ভেতর দিয়ে যা প্রবাহিত হয়.. সেটা কি?

ওটাই, অন্তর-বিদ্যুৎ।

প্রচলিত নাম... আধ্যাত্মিকতা!

[07/11, 2:15 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

বেতারে আধ্যাত্মিকতা.. ১৬

দেখুন আমরা সংগীতে আধ্যাত্মিকতা থেকে, এই ধরণের আলোচনায় চলে এলাম কেন?

কারণ আর কিছুই নয়, শুধু ওই আধ্যাত্মিকতার অনুভব ও প্রকাশের প্রযুক্তি বোঝার ও জানার জন্যে।

আমরা প্রচলিত পথের খবর না রেখে সাধারণত অপ্রচলিত পথে চলতে পারি না।

'নতুন' এই শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই –পুরোনো বলে যে কিছু আছে, তা প্রমাণ হয়ে যায়.. তাই না?

এবার ওই পুরোনো আর নতুন kichu মিলিয়ে একটু ভাবা যাক।

পূর্ব পূর্ব সব অবতারের জমাট বাঁধা রূপ আবার নতুন ভাবও সৃষ্টি করেছেন ---- আমরা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে উদ্দেশ্য করে বলে তো থাকি.. কিন্তু কেন?

এদিকে আবার আমাদের বেদান্ত ও রয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক তাহলে কি?

নানান শাস্ত্রও কতরকম কথা বলছেন, মানে ভাব প্রকাশ করছেন।

সাংখ্য দর্শন 'জন্য ঈশ্বর'বলছেন।

পাতঞ্জল যোগ দর্শন.. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না রেখেও অনুষ্ঠান করা যায়।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন গুলিও তদ্রুপ।

সঙ্গে উপনিষদ সমূহ রয়েছেন।

গীতা কে সার বলা হচ্ছে।

ভক্তিশাস্ত্র –সে ভাগবত থেকে ভক্তমালিকা, সঙ্গে উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতন সব অসাধারণ গ্রন্থসকল।

ছোট থেকে আমরা রামায়ণ, মহাভারত এর কথা এই ভারতে জানি না.. এমন কেউ নেই।

হলে এসে উপস্থিত... কথামৃত, স্বামীজীর বাণী ও রচনা ইত্যাদি।

আর শেষে এসে মাথা আরও ঘুরে গেল.. মহেন্দ্রনাথে এসে!

উপসংহার তাহলে কি?

বৌদ্ধ দর্শন তবু তো আনা হয় নি।

ওটি ছাড়া, চার্বাক ইত্যাদি ছাড়া.. প্রায় সবই নাকী আস্তিক দর্শন!

সিদ্ধান্ত কি হবে?

আদৌ কি এই ভিড় ঠেলে কিছু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাবে?

কিছু কি বুঝতে পারা যাবে?
দেখে আর বুঝে কি কিছু লাভ আছে?

এইসব প্রশ্ন কি কখনো মানুষের মধ্যে জাগে?

কখন জাগে? হাল পানি না পেয়ে, না স্বয়ংক্রিয় ভাবেই?

মনে হয়, এর কোনোটাই নয়!
তাহলে?
ওটা জেগেই ছিল সর্বদা।

সেকি? বুঝতে পারিনি তো..

বোঝা যাচ্ছে বলেই তো –এখন এই মানুষ হয়ে জন্মেছি।

তার মানে,না জেনেও আমরা এইসব নিয়ে ভেবেছি?
অতি অবশ্যই, শুধু তো ওটাই ভেবেছি আর এখনও ভাবছি।

আশ্চর্য!

একদম নয়।
কোনো অলৌকিক ব্যাপার নেই, যা রয়েছে তা –বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান কে কি আধ্যাত্মিকতা বলা যায়?
অতি অবশ্যই যায়।

তাহলে তো জগতে সবাই আধ্যাত্মিক পথেই চলেছেন..

একেবারে ঠিক কথা।